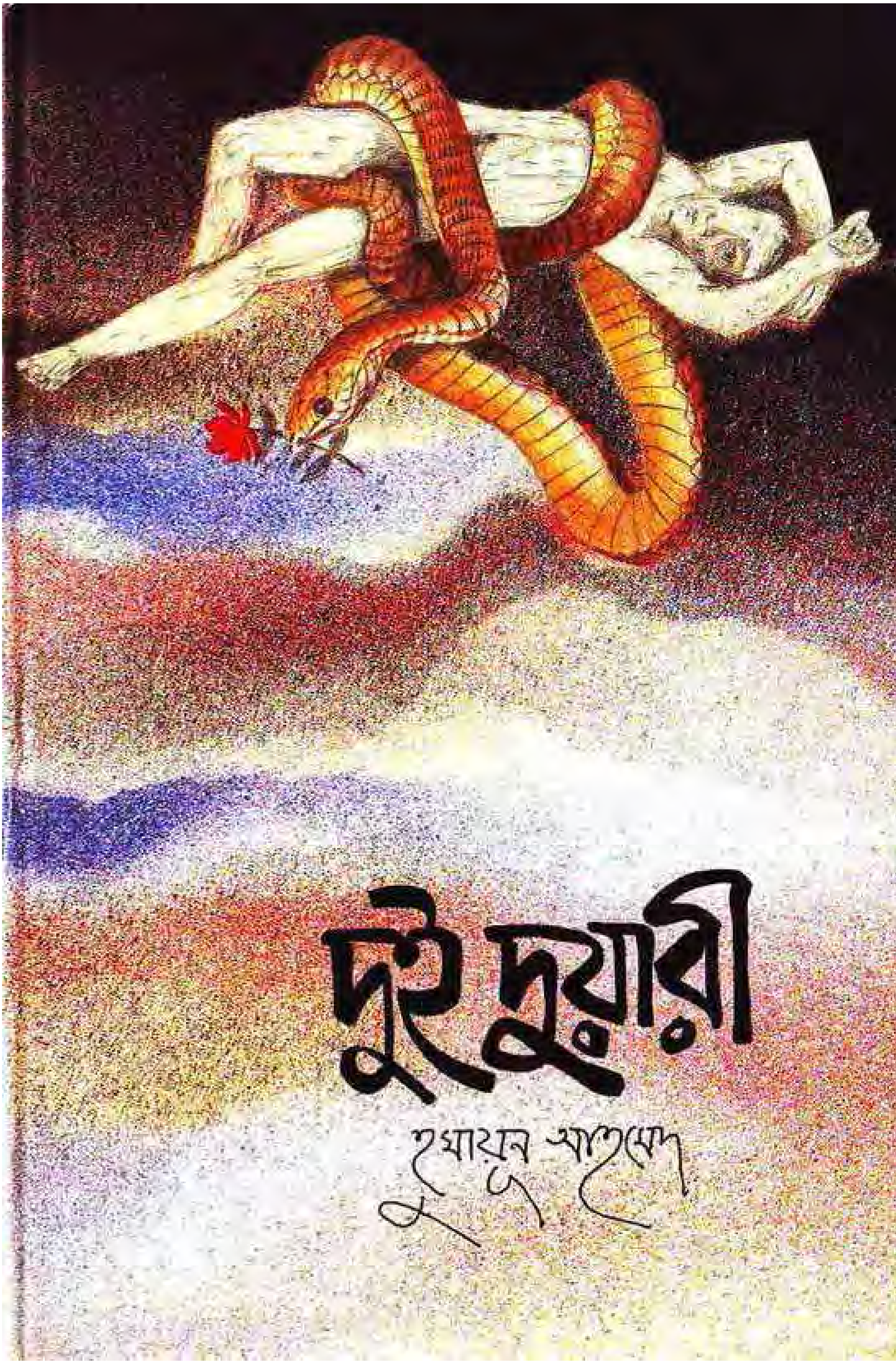
দুই দুয়ারী
হুমায়ূন আহমেদ

আমি প্রায়ই কিছু অদ্ভুত চরিত্র নিয়ে ভাবি। এমন কিছু চরিত্র যাদের কখনো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্যি এ ধরনের চরিত্র নিয়ে কিছু লিখতে ভরসা হয় না। কারণ আমি জানি লেখা মাত্র আমাকে অসংখ্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। পাঠক-পাঠিকা জানতে চাইবেন, "লোকটা কে?" "সে কোত্থেকে এসেছে?" "ব্যাপারটা কি?" "কি হচ্ছে?" আমি এসব প্রশ্নের জবাব জানি না। অবশ্যি সব প্রশ্নের জবাব যে জানতেই হবে তারও তো কোনো কথা নেই। এই ভেবেই শেষ পর্যন্ত লিখে ফেললাম। লেখার খসড়া একটি ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে পরিপূর্ণ লেখাটি প্রকাশিত হলো। কেউ গুরুত্বের সঙ্গে এই লেখাটি বিবেচনা না করলেই খুশী হবো।

হুমায়ূন আহমেদ

১লা বৈশাখ ১৩৯৮

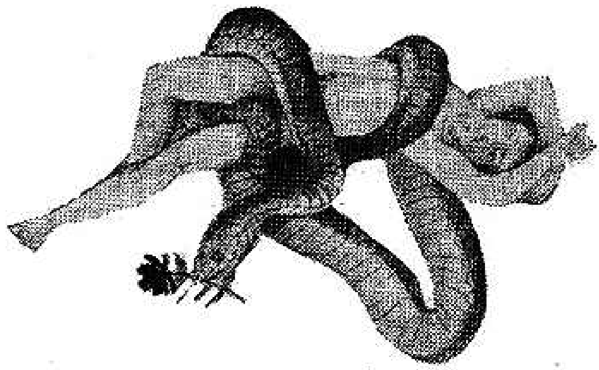

মতিন সাহেব গাড়ির একসিলেটর আরো খানিকটা নামিয়ে দিলেন। স্পীডোমিটারের কাঁটা সত্তর থেকে আশিতে চলে এল। ময়মনসিংহ-ঢাকা হাইওয়ে। ফাঁকা রাস্তা, ঘন্টায় আশি কিলোমিটার কিছুই না। মতিন সাহেবের ছোট মেয়ে মিতু পেছনের সীটে বসে আছে। তার হাতে সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা। রওনা হবার সময় সে পড়তে শুরু করেছে — এখন আর অল্প কিছু পাতা বাকি। মনে হচ্ছে ঢাকায় পৌঁছবার আগেই সে বইটা শেষ করতে পারবে। গাড়ি শালবনের ভেতর ঢুকল। মতিন সাহেব গাড়ির স্পীড আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিলেন। স্পীড বাড়াতে শুরু করলে নেশার মত হয়ে যায়। শুধু বাড়াতেই ইচ্ছা করে। মিতু বই বন্ধ করে মিষ্টি গলায় ডাকল, বাবা।

মতিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, কি মা?

'ঢাকায় পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট, গিভ এণ্ড টেক টেন মিনিটস।'

'গিভ এণ্ড টেক টেন মিনিটস মানে কি বাবা?'

তিনি প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। আচমকা আতংকে জমে গেলেন। রাস্তার মাঝামাঝি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সরে দাঁড়ানোর কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না। যে গাড়ি ঘন্টায় নব্বই কিলোমিটার যাচ্ছে তাকে মুহূর্তের মধ্যে থামানো সম্ভব নয়। লোকটির পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার মত জায়গা কি আছে?

মতিন সাহেব একই সঙ্গে হর্ন এবং ব্রেক চাপলেন। চাপা গলায় বললেন, ও মাই গড। ও মাই গড।

ধ্বক করে শব্দ হল।

লোকটি গাড়ির মাডগার্ডে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তার এক পাশে। গাড়ি তাকে ছাড়িয়ে ত্রিশ গজের মত এগিয়ে পুরোপুরি থামল। মতিন সাহেব ইগনিশন সুইচ বন্ধ করে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে।

মিতুর মুখ আতংকে শাদা হয়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাতলা ঠোঁট কালচে দেখাচ্ছে। মিতু ফিস ফিস করে বলল, বাবা লোকটা কি মারা গেছে? মতিন সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, আমার তাই ধারণা।

'এখন আমরা কি করব বাবা?'

'কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকব।'

তিনি গাড়ির গ্লোব কম্পার্টমেন্টে সিগারেটের জন্যে হাত বাড়ালেন। তাঁর মনে পড়ল দু'মাস আগে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন। গ্লোব কম্পার্টমেন্টে একটা টর্চলাইট ছাড়া কিছুই নেই। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। এ রকম একটা ঘটনা ঢাকা শহরে ঘটলে কি হত দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছেন। এতক্ষণে হাজারখানিক লোক জমে যেত। গাড়ির কাচ ভাঙ্গতো। তাকে এবং মিতুকে গাড়ি থেকে টেনে নামাতো। কিছু লোক একত্র হলে এক ধরনের হিংস্রতা আপনা আপনি জেগে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে ভয়ংকর সব কাণ্ড ঘটে।

মতিন সাহেব গাড়ির দরজা খুললেন। মিতু ভীত গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ বাবা?

'লোকটাকে দেখে আসি।'

'আমার ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কিছু নেই।'

তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর নিজেরই ভয় লাগছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মুখে থুথু জমা হচ্ছে। প্রচণ্ড ভয় পেলে শরীরের হরমোনাল ব্যালান্স নষ্ট হয়। বমি ভাব হয়, মুখে থুথু জমতে থাকে।

মিতু ক্ষীণ গলায় বলল, তাড়াতাড়ি এসো বাবা। আমার কেমন জানি লাগছে। তিনি এগিয়ে গেলেন। লোকটি মরে গিয়ে থাকলে কি করবেন বুঝতে পারছেন না। এখানে ফেলে রেখে যাবেন? না-কি তাঁর বাচ্চা মেয়ের পাশে রক্তমাখা একটা

ডেডবডি নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হবেন। মিতুর জন্যে তা হবে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁর মেয়ে এখনো তৈরী নয়। শুধু তাঁর মেয়ে নয়, তিনি নিজেও তৈরী নন। মতিন সাহেব এক দলা থুথু ফেললেন।

মতিন সাহেব লোকটির পাশে দাঁড়াতেই সে উঠে বসল। মাথা উঁচু করে তাকাল। লোকটির চোখ পিট পিট করছে। সূর্যের আলো পড়েছে তার চোখে। সে ভালমত তাকাতে পারছে না। মতিন সাহেব পুরো হকচকিয়ে গেলেন।

'লোকটি বেঁচে আছে' — তা এখনো মতিন সাহেবের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য হিসেবে ধরা পড়ছে না। তবে বেঁচে আছে তাতো দেখাই যাচ্ছে। এই তো লোকটার গায়ের নীল হাফশার্টে রক্তের ছোপ। কালো রংয়ের প্যান্টের হাঁটুর কাছটা ছেঁড়া। মতিন সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, আপনি বেঁচে আছেন?

সে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, যেন বেঁচে থাকার অপরাধে সে অপরাধী। মরে গেলেই যেন ব্যাপারটা শোভন এবং সুন্দর হত।

'আপনি কি উঠে দাঁড়াতে পারবেন?'

'জ্বি।'

লোকটি উঠে দাঁড়াল। তার হাঁটুর কাছেও অনেকখানি কেটেছে — চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

'থ্যাংক গড যে, আপনি বেঁচে আছেন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি গাড়ি ব্যাক করে আনছি। আপনাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

'লাগবে না।'

'ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখুক। আপনার তো বেঁচে থাকারই কথা না।'

সে হাসল। মতিন সাহেব লোকটির দিকে ভাল করে তাকালেন। অসম্ভব রোগা লম্বা একজন মানুষ। অতিরিক্ত রকমের ফর্সা। হাতের নীল শিরা চামড়া ভেদ করে ফুটে রয়েছে। সরল ধরনের লম্বাটে মুখ। চোখে এক ধরনের শান্ত ভাব আছে, যা শুধুমাত্র পশুদের চোখেই দেখা যায়।

গাড়িতে উঠেই লোকটি ঘুমিয়ে পড়ল। এটা ভাল লক্ষণ না। প্রচণ্ড আঘাতে মস্তিষ্কে রক্তপাত হলে ঘুম পায়। সেই ঘুম সচরাচর ভাঙ্গে না। ঘুমুতে ঘুমুতে কমায় চলে যায়। কমা থেকে মৃত্যু।

মিতু ফিস ফিস করে বলল, বাবা উনি কি ঘুমুচ্ছেন?

'হ্যাঁ মা।'

'উনার কিন্তু খালি পা।'

তিনি তাকিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যি খালি পা। পায়ে নিশ্চয়ই স্যাণ্ডেল ছিল — ছিটকে পড়েছে। লোকটিকে গাড়িতে ওঠানোর সময় খেয়াল হয়নি। এখন স্যাণ্ডেলের জন্যে আবার ফিরে যাবার কোন অর্থ হয় না।

মিতুর মুখ থেকে ফ্যাকাশে ভাব এখনো দূর হয়নি। তার বয়স দশ। এ বছর ক্লাস ফাইভে উঠেছে। তার ক্ষুদ্র জীবনে এমন ভয়ংকর ঘটনা আর ঘটেনি। সে সোনার কেল্লা বইটা তার চোখের সামনে ধরে রেখেছে কিন্তু বই-এ মন দিতে পারছে না।

'বাবা!'

'কি মা।'

'আমার কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে।'

'কিসের ভয়?'

'মনে হচ্ছে উনি মরে গেছেন।'

'আরে দূর। তুমি চুপচাপ বই পড়তে থাক। আমি বরং গান দিয়ে দি। দেব?'

'দাও।'

ভল্যুম অনেকখানি বাড়িয়ে মতিন সাহেব ক্যাসেট চালু করলেন। তিনি ভেবেছিলেন গানের শব্দে লোকটি জেগে উঠবে। তা হল না। লোকটি সীটে হেলান দিয়ে পাথরের মত পড়ে আছে। মতিন সাহেবের মনে হল মিতুর কথাই হয়ত সত্যি — লোকটি মরে গেছে। ক্যাসেটে গান হচ্ছে। মতিন সাহেব মন দিয়ে গানের কথা শুনতে লাগলেন। কোন কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

"সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা
কহো কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে সদাই ভাবনা
যা কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা ।।"

মিতু ফিস ফিস করে বলল, বাবা!

'কি মা?'

'লোকটা মরে গেলে আমরা কি করব?'

'আমরা তার আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেব।'

'তোমাকে পুলিশে ধরবে না?'

'না। এটা একটা এ্যাকসিডেন্ট।'

'আমার মনে হচ্ছে পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ভয় লাগছে বাবা।'

'ভয়ের কিছু নেই। লোকটা মরে নি।'

মতিন সাহেব আড় চোখে তাকালেন। লোকটি নড়ছে না। নিঃশ্বাস ফেলছে বলেও মনে হচ্ছে না। সম্ভবত মারা গেছে। প্রথমেই তাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন। স্পীডোমিটারের কাঁটা আবার নব্বই এর কাছাকাছি চলে এল।

না লোকটি মরেনি।

ডাকামাত্র উঠে বসল। হেঁটে হেঁটে ঢুকল ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তার জাকির হোসেন মতিন সাহেবের বন্ধু। তিনি দেখেটেখে বললেন, তেমন কিছু না। দু'-এক জায়গা ছিড়ে গেছে। ওয়াশ করে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছি। হাঁটুতে স্টীচ লাগবে। দ্যাটস ইট।

মতিন সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, মাথায় চোট পেয়েছে কি-না দেখবেন? সারা রাস্তা ঝিমুতে ঝিমুতে এসেছে।

ডাক্তার সাহেব সহজ গলায় বললেন, মাথায় চোট পেয়েছে বলে মনে হয় না। চোখের মণি ডাইলেটেড হয়নি। রিফ্লেক্স এ্যাকশন ভাল। লম্বা ঘুম দিলে ঠিক হয়ে যাবে। একটা পেইন রিলিভার দিয়ে দিচ্ছি — ব্যথা বেশী হলে খেতে হবে। প্রেসক্রিপশন লিখতে গিয়ে ডাক্তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বিব্রত চোখে তাকাল। যেন খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

'বলুন, নাম বলুন।'

'আমার কোন নাম নেই।'

'নাম নেই মানে?'

লোকটি মাথা নিচু করে ফেলল। আড় চোখে তাকাল মতিন সাহেবের দিকে। তার চোখে চাপা সংশয়। মতিন সাহেব খানিকটা হকচকিয়ে গেছেন। তাকাচ্ছেন মিতুর দিকে। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি কি নাম মনে করতে পারছেন না?

'না।'

'আপনার পরিচিত কারোর নাম মনে আছে?'

লোকটি মিতুর দিকে তাকিয়ে বলল, এই মেয়েটার নাম মিতু।

'এই মেয়ে ছাড়া অন্য কারোর নাম মনে পড়ছে না?'

'না।'

'আপনি কি করেন বলুন তো?'

'কিছু করি না।'

'কিছু নিশ্চয়ই করেন — এখন মনে করতে পারছেন না, তাই না?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা, এ্যাকসিডেন্টের পরের ঘটনা মনে আছে?'

'আছে।'

'দু-একটা বলুন তো শুনি।'

'মিতু তার বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। গান হচ্ছিল।'

'কি গান?'

লোকটি মতিন সাহেবকে পুরোপুরি চমকে দিয়ে গানের প্রতিটি লাইন বলে গেল। মতিন সাহেব যেমন চমকালেন ডাক্তার তেমন চমকালেন না। সহজ গলায় বললেন, সাময়িক এ্যামনেশিয়া। শকটা কেটে গেলে ঠিক সয়ে যাবে। ভাল মত রেস্ট হলেই স্মৃতি ফিরে আসবে। ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। দশ মিলিগ্রাম করে ফ্রিজিয়াম ঘুমুতে যাবার এক ঘন্টা আগে খেতে হবে।

ডাক্তার লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কি বমি ভাব হচ্ছে?

'জ্বি না।'

'মাথা ঘুরছে?'

'ঘুরছে না তবে — কেমন যেন লাগছে।'

'আচ্ছা বসুন, এখানে আমি আপনার ব্লাড প্রেসার মাপি।'

মতিন সাহেব ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে চলে এলেন। তাঁকে একটা সিগারেট খেতেই হবে। মিতু তার পেছনে পেছনে এল। রাস্তার পাশের সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনলেন। মুখে এখনো থুথু জমা হচ্ছে। একটা মিষ্টি পান কিনলেন। মিতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, পান খাবিরে মিতু?

'খাব। মিষ্টি পান।'

মিতু পান মুখে দিয়ে বড়দের মত পিক ফেলে বলল, লোকটাকে এখন আমরা কি করব?

'বুঝতে পারছি না। ভাবছি একটা শার্ট এবং প্যান্ট কিনে দেব। শ' দু'এক টাকা দিয়ে দেব। ও বাড়ি চলে যাবে।'

'বাড়িতো চেনে না। যাবে কি ভাবে?'

'তুই কি করতে বলছিস?'

'কয়েকদিন আমাদের বাসায় থাকুক। তুমি খোঁজ করে তার আত্মীয়-স্বজন বের কর।'

'এটাও করা যেতে পারে।'

মতিন সাহেব চেম্বারে ঢুকলেন। লোকটি খুশী খুশী গলায় বলল, আমার ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক। হার্ট বিটও স্বাভাবিক।

মতিন সাহেব বললেন, সব কিছু স্বাভাবিক হলেই ভাল।

তিনি লোকটিকে বাসায় নিয়ে এলেন।

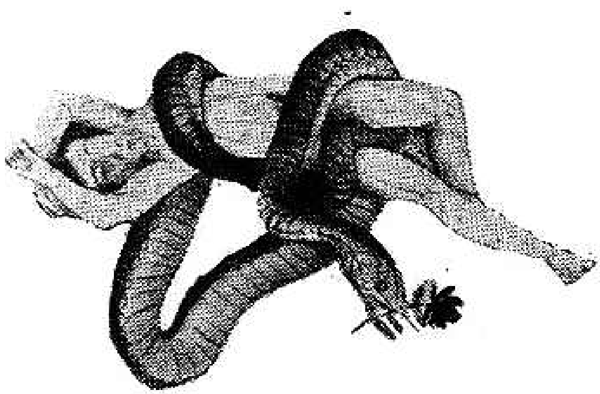

মতিন সাহেবের বাসা বনানীতে।

নিজের বাড়ি নয় — ভাড়া করা। পুরানো ধরনের বাড়ি। অনেকগুলি ঘর। সামনে ফাঁকা জায়গায় দেশী ফুলের গাছ। চাপা গাছ, কেয়া গাছ, হাসনাহেনা। জংলা জংলা ভাব আছে। বাড়ির দক্ষিণে দু'টা ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছ। একটা কাঁঠাল গাছের তলা বাঁধানো। ছুটির দিনের দুপুরে মিতু এইখানে বসে একা একা সাপ-লুডু খেলে। কাঁঠাল তলার আরেকটা নাম আছে — কান্নাতলা। মন খারাপ হলে মিতু এখানে বসে কাঁদে।

এত বড় বাড়িতে মানুষের সংখ্যা অল্প।

মতিন সাহেবের স্ত্রী — সুরমা। তিনি মতিঝিল জনতা ব্যাংকের মহিলা-শাখার ম্যানেজার। সারাদিন অফিসেই থাকেন। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে প্রথমেই সবাইকে খানিকক্ষণ বকা ঝকা করেন, তারপর উঠে যান দোতলায়। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর মাথা ধরে। দোতলায় তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘন্টা দু'এক চোখ বন্ধ করে

শুয়ে থাকেন। তারপর একতলায় নেমে এসে আবার সবাইকে খানিকক্ষণ বকা ঝকা করেন। ঝড়-ঝাপ্টা বেশীর ভাগ যায় তাঁর বড় ছেলে সাবেরের উপর দিয়ে। সাবের এই পরিবারে বড় ধরনের সমস্যা তৈরী করেছে। সবাইকে অশান্তিতে ফেলেছে।

সাবের দোতলায় থাকে। একেবারে কোনার দু'টি ঘর তার। একটি স্টাডি রুম, অন্যটি শোবার ঘর। সাবের তিন বছর আগে ডাক্তারী পাস করেছে। পাস করবার পরপরই ঘোষণা করেছে ডাক্তারী কিছুই সে শিখতে পারেনি। সে চিকিৎসার ক, খও জানে না। কাজেই ডাক্তারী করবে না। মতিন সাহেব সাবেরকে ডেকে বলেছিলেন, শুনলাম তুমি চাকরি-বাকরি নিতে চাও না — সত্যি?

সাবের শান্ত গলায় বলেছে, সত্যি। প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে চাই না।

'কেন চাও না?'

'আমি ডাক্তারী কিছুই শিখতে পারিনি।'

'পরীক্ষায় তো খুব ভাল রেজাল্ট করেছ।'

'তা করেছি, কিন্তু আমার কিছুই মনে নেই।'

'কিছুই মনে নেই বলতে কি মিন করছ?'

'যেমন ধর ডিপথেরিয়া। কিছুক্ষণ আগে ডিপথেরিয়া নিয়ে চিন্তা করছিলাম। ডিপথেরিয়াতে এন্টিটক্সিন দিতে হয় এবং এন্টিবায়োটিক দিতে হয়। এন্টিটক্সিনের ডোজ কিছুই মনে নেই। ডিপথেরিয়াতে কার্ডিয়াক ফেইলিউর হয় — কেন হয় তাও মনে নেই।'

'সব কিছু মনে থাকতে হবে?'

'অফ কোর্স মনে থাকতে হবে। মানুষের জীবন নিয়ে কথা।'

'তুমি তাহলে কি করবে?'

'আমি নিজে নিজে পড়ব। যেদিন বুঝব যা জানার সব জেনেছি সেদিন চিকিৎসা শুরু করব।'

মতিন সাহেব বললেন, তুমি যা করছ তা যে এক ধরনের পাগলামি তা-কি বুঝতে পারছ?

'না বুঝতে পারছি না।'

'আমি কিছুই বলব না। এইসব পাগলামি তুমি তোমার মা'র কাছ থেকে পেয়েছ। তোমার মাকে আমি যেমন কিছু বলি না — তোমাকেও বলব না। তবে আশা করব যে, দ্রুত পাগলামি কাটিয়ে উঠবে।'

সাবের মাথা নিচু করে রাখল। কিছু বলল না। মতিন সাহেব বললেন, বুঝতে পারছ কি বলছি?

'পারছি।'

'পাগলামি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

পাগলামি কাটিয়ে ওঠার কোন রকম লক্ষণ সাবেরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তার স্টাডি রুমে চিকিৎসা শাস্ত্রের রাজ্যের বই। সারাদিন সে বই পড়ে। যে সময়টা বই পড়ে না — বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। এমাথা ওমাথায় যায় — ওমাথা থেকে এমাথায় আসে। যা পড়েছে তা মনে করার চেষ্টা করে।

দোতলায় মা'র ঘরের পাশের ঘরে থাকে মিতু এবং এষা। মেজো মেয়ে এষা ইংরেজী সাহিত্যে সেকেন্ড ইয়ার অনার্স পড়ছে। রূপবতী না হলেও স্নিগ্ধ চেহারা, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। ছেলেটির নাম জুবায়ের। লেদার টেকনোলজিতে জার্মানী থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। নিজেই ছোটখাটো ইণ্ডাস্ট্রির মত শুরু করেছে। শুরুটা করেছে চমৎকার। জুবায়ের প্রায়ই এ বাড়িতে আসে। বাড়ির প্রতিটি সদস্য এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে।

মতিন সাহেবের বড় মেয়ের নাম নিশা। মাত্র কিছুদিন হল তার বিয়ে হয়েছে। এই মেয়েটি অসম্ভব রূপবতী। রূপবতীদের সাধারণ ক্রটি — অহংকার তার মধ্যে পুরোপুরি আছে। নিশার স্বামী ফজলুর রহমান গোবেচারা ধরনের মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথমেটিক্সের এসোসিয়েট প্রফেসর। নিশা এই বিয়েতে সুখী হয়নি বলে মনে হয়। বাবার বাড়িতে সে যখন আসে — স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির বদনাম করতে আসে। মাঝে মাঝে কান্নাকাটিও করে।

মতিন সাহেব থাকেন এক তলায়। বলা চলে একা একাই থাকেন। এমনও দিন যায় — স্ত্রীর সঙ্গে তার কথাই হয় না। এই নিয়ে তাঁর মনে কোন ক্ষোভ আছে বলে মনে হয় না। মতিন সাহেবের পাশের ঘরে থাকে মিতুর ছোট মামা মন্টু। জগন্নাথ কলেজ থেকে দু'বার বি.এ.পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে সে তৃতীয়বারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মন্টুর ঘরের দরজায় বড় বড় করে লেখা —

মনোয়ার আহমেদ মন্টু

তার নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা — বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। মন্টুর ঘর দিন-রাতই খোলা। যার ইচ্ছা সে ঘরে ঢুকছে এবং বেরুচ্ছে। মতিন সাহেবের

পরিবারের এই হচ্ছে মোটামুটি পরিচয়। এরা ছাড়াও দু'জন কাজের লোক, একজন বাবুর্চি, একজন মালী, একজন দারোয়ান, একজন ড্রাইভার এ বাড়িতেই থাকে। এদের থাকার জায়গা বাড়ির পেছনের টিন শেডে। এইসব মানুষের সঙ্গে তিনদিন আগে আরেকজন মানুষ যুক্ত হয়েছে যার কোন নাম নেই এবং যে পুরানো কোন কথা মনে করতে পারছে না।

এক তলায় একটা ঘর তাকে দেয়া হয়েছে। নির্বিকার ভঙ্গিতেই সে সেই ঘরে আছে। খাওয়া-দাওয়া করছে, ঘুমুচ্ছে। যেন এটা তার নিজেরই ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান গাইতেও শোনা যাচ্ছে। একটিই গান —

সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা
কহো কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।

মতিন সাহেব লোকটির খোঁজ বের করার ভালই চেষ্টা করেছেন। থানায় ডায়েরী করিয়েছেন। দু'টি দৈনিক পত্রিকায় 'সন্ধান চাই' বিজ্ঞাপন ছবিসহ ছাপা হয়েছে। এ্যাকসিডেন্ট যেখানে হয়েছিল সেখানেও লোক পাঠিয়েছিলেন। কেউ কোনরকম সন্ধান দিতে পারেনি। মতিন সাহেব বুঝতে পারছেন না, তার কি করণীয় আছে। তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন আরো তিন-চারদিন দেখে লোকটাকে যেখান থেকে তুলেছেন সেখানে রেখে আসবেন। কাজটা অমানবিক হলেও কিছু করার নেই। সঙ্গে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দিলেই হবে। লোকটি স্মৃতিশক্তি তার কারণেই হারিয়েছে তাতো নাও হতে পারে। হয়ত আগে থেকেই স্মৃতিশক্তি ছিল না।

বুধবার সন্ধ্যা।

মতিন সাহেব বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন। এষা ট্রেতে করে চা, এক পিস কেক এবং কলা এনে সামনে রাখল। মতিন সাহেব বললেন, কেমন আছ মা?

এষা হাসি মুখে বলল, ভাল আছি। তুমি কেমন আছো বাবা?

'আমি মন্দ আছি।'

পিতা এবং কন্যা দু'জনই একসঙ্গে হেসে উঠল। এষা কথা-বলা শেখার পর থেকে এই জাতীয় বাক্যালাপ দু'জনের মধ্যে চলছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধরনটা একটু পাল্টাচ্ছে। এষার পাঁচ বছর বয়সে কথাবার্তা হত এ রকম ঃ

মতিন সাহেব উঁচু গলায় বলতেন, কেমন আছ মা-মণি।

এষা প্রায় চিৎকার করে বলতো, তুমি কেমন আছো বাবা-মণি।

'আমি মন্দ আছি।'

'আমিও মন্দ আছি। হি- হি- হি।'

আজ দু'জনেরই বয়স বেড়েছে কিন্তু এই একটা জায়গায় যেন বয়স আটকে আছে। এষা বাবার সামনে চা রাখল। কোমল গলায় বলল, কলার খোসা ছাড়িয়ে দেব বাবা? মতিন সাহেব বললেন, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কলার খোসা ছড়ানো দারুণ কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটা করে তুই আমাকে সাহায্য করতে চাস। কিচ্ছু করতে হবে না — তুই আমার সামনে বোস। বসতে বলার দরকার ছিল না — এষা নিজ থেকেই বসত। সন্ধ্যাবেলা বেশ কিছুটা সময় সে বাবার সঙ্গে বসে। মতিন সাহেব মেয়ের কাছ থেকে বাড়ির সারাদিনের খবরাখবর নেন। এষাকে এ বাড়ির গেজেট বলা চলে। কিছুই তার চোখ এড়ায় না। বলেও খুব গুছিয়ে।

মতিন সাহেব চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, আজ তোর মা আছে কেমন?

'জানি না। ইউনিভার্সিটিতে যাবার আগে উঁকি দিয়েছিলাম। মা খ্যাক করে উঠেছেন — কেন ডিসটার্ব করছ?'

'বেচারী খেটেখুটে বাসায় আসে। ডিসটার্ব না করলেই হয়।'

'ডিসটার্ব আবার কি? আমি মা'র সঙ্গে কথাও বলব না?'

'যখন মন-টন ভাল থাকবে তখন কথা বলবি।'

'তাঁর মন কখনোই ভাল থাকে না।'

'তাও ঠিক।'

'আরেকটা খবর আছে বাবা।'

'বলে ফেল।'

'হরিপ্রসন্ন স্যার এসেছেন।'

মতিন সাহব বিরক্ত মুখে বললেন, কেন?

'কিছু বলেন নি। দেখে মনে হল খুব অসুস্থ। তুমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলবে? ডাকব?'

'না — এখন কথা বলব না। মনটা ভাল না।'

'মন ভাল না কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন না। সিগারেট ধরালেন। তিনি এখন পুরোদমে সিগারেট খাচ্ছেন। দিনে এক প্যাকেটের বেশী লাগে।

এষা একটু চিন্তিত বোধ করল। বাবার সিগারেট শুরু করা মানে তাঁর ওষুধের কারখানায় বড় ধরনের কোন সমস্যা। যে সমস্যা নিয়ে তিনি কখনো কারো সঙ্গে কথা বলেন না।

'সাবেরের খবর কি রে?'

'দাদা ভালই আছে। একটা নর-কংকাল কিনে এনেছে। অস্থিবিদ্যা যা শিখেছিল সব ভুলে গেছে। আবার নতুন করে না-কি শিখতে হবে।'

মতিন সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এষা বলল, মার সঙ্গে দাদাকেও নিয়ে যাও। তাকেও কোন একজন বড় সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার। আরেক কাপ চা দেব বাবা?

'না।'

'তুমি আবার সিগারেট ধরিয়েছ। তোমার কারখানায় কি কোন সমস্যা হচ্ছে?' মতিন সাহেব এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। মনে হল তিনি শুনতে পাননি। এষা বলল, তুমি তো ঐ লোকটা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে না।

'কোন লোকটা?'

'ঐ যে যাকে নিয়ে এসেছ। এ্যামনেশিয়া হয়েছে।'

'ওর কোন খবর আছে না-কি?'

'না। দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে। মনে হচ্ছে এ বাড়িতে সে সুখে আছে।'

'কারো সঙ্গে কথা-টথা বলে না?'

'নিজ থেকে বলে না। কেউ কিছু বললে খুশী হয়ে জবাব দেয়। আজ দুপুরে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে দেখি সে কাঁঠাল গাছের নিচে বসে মিতুর সঙ্গে লুডু খেলছে।'

'তুই কি কথা বলেছিস?'

'না। কথা বলতাম। কিন্তু লোকটাকে আমার কেন জানি পাগল মনে হয়। চোখের দৃষ্টি যেন কেমন।'

'আরে দূর — চোখের দৃষ্টি ঠিকই আছে। লোকটা কিছু মনে করতে পারছে না এই জন্যে তুই ভয় পাচ্ছিস। তোর কাছে মনে হচ্ছে লোকটা পাগল। তুই বরং লোকটার সঙ্গে কথা বল।'

'কেন?'

'কথা বললে বুঝতে পারবি — তার ব্যাকগ্রাউণ্ড কি? কি ধরনের ফ্যামিলি থেকে এসেছে। পড়াশোনা কি। এতে লোকটাকে ট্রেস করতে সুবিধা হবে।'

'তুমি তো অনেক কথা বলেছ — তোমার কি মনে হয়?'

মতিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমি খানিকটা কনফিউজড।

'সে কি?'

মতিন সাহেব আরো একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরাতে ধরাতে লক্ষ্য করলেন, লোকটা হেঁটে হেঁটে কাঁঠাল গাছগুলির দিকে যাচ্ছে। মতিন সাহেব বললেন, লোকটার একটা নাম দরকার। এম্নিতে ডাকার জন্য একটা নাম। যতদিন আসল নাম পাওয়া না গেছে ততদিন এই নামে ডাকব।

'নাম তো বাবা দেয়া হয়েছে।'

'কি নাম?'

'নাম হচ্ছে জুলাই।'

'জুলাই?'

'হ্যাঁ, জুলাই। মিতু নাম রেখেছে। এখন জুলাই মাস, কাজেই তার নাম জুলাই। যখন আগস্ট মাস আসবে তখন তার নাম হয়ে যাবে আগস্ট। মিতুর খুব ইচ্ছা — লোকটা যেন সারাজীবন এই বাড়িতে থাকে, যাতে সে প্রতিমাসে একবার করে নাম বদলাতে পারে।'

এষা খিল খিল করে হেসে উঠল। মতিন সাহেব বললেন, আরেক কাপ চা আন তো মা।

'আরেক কাপ চা এনে দিচ্ছি — কিন্তু বাবা তুমি তোমার সিগারেটের প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে দাও। এরপর তোমার সিগারেট খেতে ইচ্ছা করলে — আমার কাছে চাইবে।'

মতিন সাহেব সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে দিলেন।

এষা চা বানিয়ে এনে দেখে, তার বাবা ঘুমুচ্ছেন। তন্দ্রা নয় — বেশ ভাল ঘুম। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত একজন মানুষের ঘুম । এষার তাকে জাগাতে ইচ্ছা করল না। সে চায়ের কাপ নিয়ে বাগানে নেমে গেল। জুলাই নামের লোকটাকে দিয়ে আসা যাক। তার সঙ্গে কথাও হয়নি। কিছুক্ষণ কথা বলা যেতে পারে। তবে নিজের হাতে চা নিয়ে যাওয়াটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। লোকটা লাই পেয়ে যেতে পারে ; বরং সে নিজেই নিয়ে এসে চা খাবে। চা খেতে খেতে দু'একটা কথা বলবে।

বাগানের এই দিকটা অন্ধকার। চল্লিশ পাওয়ারের একটা বাল্ব ফিউজ হয়েছে, নতুন বাল্ব লাগানো হয়নি। তবে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের আলো খানিকটা এসেছে

এদিকে। সেই আলোয় অস্পষ্ট করে হলেও সবকিছু চোখে পড়ে। লোকটিকে কাঁঠাল গাছের নীচে পা তুলে বসে থাকতে দেখা গেল।

বসে থাকার ভঙ্গিটি মজার। পা তুলে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসা। শিরদাড়া সোজা করা। ধ্যান-ট্যান করছে না-কি? লোকটা বসেছে উল্টোদিকে। এষা এগুচ্ছে পেছন দিক থেকে। লোকটার মুখ দেখতে পারছে না। পেছন দিক থেকে একটা মানুষের কাছে যেতে ভাল লাগে না।

'কেমন আছেন?'

লোকটা চমকে উঠল। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। এষা বলল, আমি মিতুর বড় বোন। লোকটা নীচু গলায় বলল — জ্বি, আমি জানি। মিতু বলেছে।

'আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

লোকটি বলল, আপনিও বসুন।

কথাগুলি এত সহজ এবং এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলা হল যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত একজন মানুষ কথা বলছে। এষা বসল। বসতে বসতে বলল, বাবা আপনার খোঁজ বের করার খুব চেষ্টা করছেন। আপনার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন?

'দেখেছি।'

'থানায় খবর দেয়া হয়েছে। যেখান থেকে আপনাকে তুলে এনেছেন সেখানেও লোক পাঠানো হয়েছে।'

'আমি জানি। আপনার বাবা আমাকে বলেছেন।'

'আপনি কি কিছুই মনে করতে পারেন না?'

'জ্বি না।'

'এর জন্যে আপনার মন খারাপ লাগছে না?'

'না।'

'আশ্চর্য! আপনার আত্মীয়-স্বজন কারা, তাঁরা কোথায় আছেন — এই ভেবে মন খারাপ হচ্ছে না?'

লোকটি চুপ করে রইল।

এষা বলল, আপনার আত্মীয়-স্বজনরা নিশ্চয়ই খুব দুঃশ্চিন্তায় আছেন। ছোটাছুটি করছেন।

লোকটি চুপ করেই রইল। যেন এই প্রসঙ্গে সে কোন কথা বলতে আগ্রহী নয়। এষা বলল, আপনার পড়াশোনা কতদূর?

'জানি না।'

'আচ্ছা আমি একটা ইংরেজী কবিতা বলি আপনি এর বাংলা কি, বলুন তো

Remember me when I am gone away.

Gone far away into the silent land.'

'আমি অর্থ বলতে পারছি না।'

'আপনি কি ইংরেজী জানেন না?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় জানি না।'

'ও আচ্ছা। আমার মনে হচ্ছিল, আপনি ইংরেজী জানেন।'

'আমি জানি না।'

এষা উঠে দাঁড়াল। লোকটি বলল, চলে যাচ্ছেন?

'হ্যাঁ, আপনিও ঘরে চলে যান। বৃষ্টি নামবে। দেখুন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।'

লোকটি জবাব দিল না।

রাত ন'টার দিকে বৃষ্টি নামল। এষা নিজের ঘরে পড়ছিল। মালী এসে বলল, আপা লোকটা কাঁঠাল গাছের নীচে বইয়া বৃষ্টিতে ভিজতাছে।

'কেন?'

'জানি না। ঘরে যাইতে বললাম, যায় না।'

'না গেলে না যাবে। ভিজুক।'

'পাগল–ছাগল মানুষ বাড়িতে রাখা ঠিক না আপা।'

'তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।'

মালী চলে গেল। এষা জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। লোকটা বসে আছে। বৃষ্টিতে ভিজছে। তার মধ্যে কোন রকম বিকার নেই। যেন একটা পাথরের মূর্তি। লোকটা কি পাগল? কথাবার্তায় অবশ্যি মনে হয়নি। ইংরেজী জানে না — তার মানে মূর্খ ধরনের মানুষ।

কাজের মেয়েটি এসে বলল, আপা আপনার টেলিফোন।

'কার টেলিফোন?'

কাজের মেয়েটি মুখ টিপে হাসল। যার মানে এই টেলিফোন জুবায়ের করেছে। জুবায়ের টেলিফোন করলেই এ বাড়িতে এক ধরনের চাপা হাসি হাসা হয়। এর কোন মানে আছে?

এষা টেলিফোন ধরল।

'কে এষা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের এদিকে কি বৃষ্টি হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। হচ্ছে।'

'অল্প–স্বল্প না ক্যাটস এণ্ড ডগস?'

'ভালই হচ্ছে।'

'বৃষ্টিতে ভিজবে এষা?'

'না।'

'না কেন?'

'আগে একবার তোমার সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজেছি, তারপর তুমি যে কাণ্ড করেছো তারপর আমার আর সাহসে কুলায় না।'

'আজ আমি সন্ন্যাসীর মত আচরণ করব। তোমার কাছ থেকে সবসময় চার হাত দূরে থাকব। ওয়ার্ড অব অনার। চলে আসব?'

'আস।'

'ভাল কথা, ঐ লোকটার কোন খোঁজ পাওয়া গেছে? মিঃ জুলাই?'

'না।'

'লোকটার সম্পর্কে আমার কি ধারণা শুনতে চাও? আমার ধারণা ব্যাটা একটা ফ্রড। বিরাট ফ্রড। স্মৃতিশক্তি হারানোর ভান করে তোমাদের এখানে মজায় আছে।'

'আমাদের এখানে মজার কি আছে।'

'ফুড এণ্ড শেলটার আছে। এই শহরে ক'টা লোকের ফুড এণ্ড শেলটার আছে জান? এবাউট ফর্টি পারসেন্ট লোকের নেই। তোমরা এক কাজ কর। ঘাড় ধরে ঐ লোকটাকে বের করে দাও।'

'লোকটার উপর তোমার এত রাগ কেন?'

'ফ্রড লোকজন আমি সহ্য করতে পারি না। লোকটার গালে পঞ্চাশ কেজি ওজনের দু'টো চড় দিলেই দেখবে হারানো স্মৃতি ফিরে এসেছে। ফড় ফড় করে কথা বলছে।'

'কে দেবে চড়?'

'কেউ দিতে রাজি না থাকে আমি দেব।'

'আচ্ছা চলে এস। এসে চড় দিয়ে যাও।'

এষা টেলিফোন রেখে জানালার পাশে চলে গেল — লোকটা এখনো বৃষ্টিতে ভিজছে। এই কাণ্ড সে কি ইচ্ছা করে করছে? দেখাতে চাচ্ছে — তার মাথা ঠিক নেই?

সাবের বারান্দায় হাঁটছিল।

হাঁটতে হাঁটতে সারা দুপুর যা পড়েছে তা মনে করার চেষ্টা চলছে। বেশীর ভাগই মনে পড়ছে না। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তার ধারণা, ব্রেইন পুরোপুরি গেছে। আধঘন্টা আগের পড়া জিনিসও কিছুই মনে নেই।

কিছুক্ষণ আগে সে ডায়েট সম্পর্কে পড়ছিল। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের কি কি মিনারেল লাগে, কতটুকু লাগে। সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। মনে করার চেষ্টা করেও লাভ হচ্ছে না।

ক্যালসিয়াম ঃ দৈনিক ১ গ্রাম । WHO বলছে তারচে' কম হলেও চলে ০.৪ থেকে ০.৭।

আয়রণ ঃ ১৫ মিলিগ্রাম

আয়োডিন ঃ ০.১ মিলিগ্রাম।

ফসফরাস ঃ ১ গ্রাম।

আসল জিনিসটাই মনে আসছে না 'সোডিয়াম কতটুকু দরকার'। অনেকখানি দৈনিক খাবার লবণ শরীরে যাচ্ছে — দরকার কতটুকু? এই লবণের সঙ্গে আবার ব্লাড-প্রেসার জড়িত। ফ্লোরিনও তো দরকার। কতটুকু? একটু আগে পড়া অথচ কিছুই মনে পড়ছে না। সাবেরের প্রায় কান্না পাচ্ছে।

মিতু একতলা থেকে দোতলায় উঠে এল। বারান্দায় সাবেরকে হাঁটাহাঁটি করার দৃশ্য সে খানিকক্ষণ দেখে — সহজ স্বরে বলল, ভাইয়া তুমি বৃষ্টিতে ভিজছ।

সাবের তার দিকে তাকাল। কিছু বলল না। তার চোখে-মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি। সোডিয়াম ইনটেকের পরিমাণ মনে করতে হবে। যেভাবেই হোক মনে করতে হবে। মিতু আবার বলল, ভাইয়া, তুমি বৃষ্টিতে ভিজে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গেছো।

'বিরক্ত করিস না-তো।'

'তোমাকে কি রকম যেন পাগলের মত লাগছে।'

'তাই না-কি?'

'হুঁ।'

সাবের এই প্রথম লক্ষ্য করল বৃষ্টির ছাটে সে সত্যি সত্যি অনেকখানি ভিজেছে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ঠাণ্ডা লাগলে অনেক রকম কমপ্লিকেশন। শরীরের ডিফেন্স সিসটেম দুর্বল হয়ে যাবে। ভাইরাস জেঁকে ধরবে। ইনফ্লুয়েনজা, . . . আচ্ছা ইনফ্লুয়েনজা ভাইরাসের নাম কি যেন।

'মিতু।'

'কি?'

'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ। অল্প একটু বাকি। পুরোপুরি পাগল হলে তুমি কি করবে?'

'জানি না।'

'মিস্টার জুলাই-র মত বৃষ্টিতে বসে বসে ভিজবে?'

'মিস্টার জুলাইটা কে?'

'ঐ দেখ কাঁঠাল গাছের নীচে বসে ভিজছে।'

'লোকটা কে?'

'কেউ জানে না কে। আমরা যখন ময়মনসিংহ থেকে আসছিলাম তখন গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফেলে দেই। প্রথম ভাবলাম মরে গেছে। কিন্তু মরে নাই। বাসায় নিয়ে এসেছি। এই লোকটাও তোমার মত কিছু মনে রাখতে পারে না।'

'কতদিন হল আছে?'

'চারদিন হয়ে গেল।'

'আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি।'

'তোমাকে বলে কি হবে?'

সাবের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাও ঠিক। আমি নিজের যন্ত্রণাতেই অস্থির। অন্যের যন্ত্রণা নিয়ে চিন্তার সময় আমার কোথায়। সাবের বলল, মিতু তুই আমাকে চা খাওয়াতে পারবি?

'না।'

'কাজের মেয়েটাকে বলে আসতে পারবি তো? না-কি তা-ও পারবি না।'

'তা-ও পারব না। আমি দোতলা থেকে মিস্টার জুলাইকে দেখব।'

'একটা মানুষ বৃষ্টিতে ভিজছে তার মধ্যে দেখার কি আছে?'

'লোকটা পাথরের মত বসে আছে। একটুও নড়ছে না। কখন নড়ে সেটা দেখব। বারান্দার লাইটটা জ্বালিয়ে দাও তো ভাইয়া লোকটার গায়ে আলো

পড়ুক।'

সাবের বাতি জ্বালিয়ে দিতেই লোকটার উপর আলো পড়ল। সাবের বিরক্ত হয়ে বলল, তুই না বললি লোকটা পাথরের মত বসে আছে, নড়ছে না। ঐ তো নড়ছে। সত্যিই তাই। লোকটা মাথার পানি ডান হাতে মুছছে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সাবেরের দিকে তাকাল।

'মিতু, ভদ্রলোকের নাম কি বললি?'

'মিস্টার জুলাই। আর তিনদিন পর উনার নাম হবে মিস্টার আগস্ট।'

'আমি বোধহয় পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছি, তোর কথাবার্তা কিছুই বুঝছি না। আর তিনদিন পর তার নাম মিস্টার আগস্ট হবে কেন?'

'ভাইয়া, তোমার সঙ্গে আমি এত কথা বলতে পারব না। তুমি কোন কিছু বুঝিয়ে বললেও বোঝ না।'

মিতু বারান্দার এক কোণায় চলে গেল। এখান থেকে লোকটাকে ভাল দেখা যায়। সাবের নীচে গেল। সে নীচে নামল কাজের মেয়েটিকে চায়ের কথা বলার উদ্দেশ্যে। নীচে নেমে তা মনে রইল না। বাগানে নেমে গেল। মিস্টার জুলাই-এর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছা করছে। তিনদিন পর তার নাম মিঃ আগস্ট কেন হচ্ছে তা জানা দরকার। জেনে ফেলার একটা বিপদও আছে — মস্তিষ্কের মেমোরী সেলে ইনফরমেশনটা থেকে যাবে। অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশন। প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন রাখার জায়গা টান পড়ে যাবে।

বৃষ্টি এখন আর আগের মত পড়ছে না। গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে। লোকটা বসেই আছে। সাবের তার কাছাকাছি এগিয়ে গেল। বিস্ময়মাখা গলায় বলল, ভাই আপনি কে?

লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে পরিচিত ভঙ্গিতে তাকাল। যেন এই হাসির মধ্যেই তার পরিচয় লুকানো। সাবের বলল, আপনার নাম কি মিস্টার জুলাই?

'জ্বি।'

'আপনাকে একটা জরুরী কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম এখন মনে করতে পারছি না —।'

লোকটি হাসি মুখে বলল, আপনি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন তিনদিন পর আমার নাম মিস্টার আগস্ট কেন হবে।

'হ্যাঁ তাই — তাই। আপনি বুঝলেন কি করে? আপনি কি থট রিডিং জানেন?'

'না। আপনি দোতলার বারান্দায় মিতুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি শুনতে পেলাম। উপর থেকে কথা বললে অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়।'

'আপনি বৃষ্টিতে ভিজছেন কি জন্যে?'

'ভিজতে ভাল লাগছে এই জন্যে ভিজছি।'

'ঠাণ্ডা লাগবে তো। একবার ঠাণ্ডা লেগে গেলে বিরাট সমস্যায় পড়বেন। কোল্ড ভাইরাস আক্রমণ করবে। ইনফ্লুয়েনজা। সেখান থেকে রেসপিরেটরী ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। আমি একজন ডাক্তার।'

'জানি, মিতু বলেছে।'

'অবশ্যি আমি ডাক্তারী প্র্যাকটিস করছি না। কিছুই মনে রাখতে পারি না। ভুলে যাই। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সোডিয়াম ইনটেক কতটুকু প্রয়োজন অনেকক্ষণ ধরে মনে করার চেষ্টা করছি, পারছি না।'

'মনে রাখার চেষ্টা খুব বেশী করছেন বলে এই সমস্যা হচ্ছে। আপনি এক কাজ করুন, ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। এতে ফল হতে পারে।'

সাবের বিস্মিত হয়ে বলল, ভুলে যাবার চেষ্টা কিভাবে করব?

'মনে রাখার চেষ্টা যেভাবে করেন তার উল্টোভাবে করবেন।'

'মনে রাখার চেষ্টা আমি কিভাবে করি?'

লোকটি এর উত্তরে হেসে ফেলল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাবেরের মনে পড়ল একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্যে দৈনিক ১ থেকে ২ গ্রাম খাবার লবণই যথেষ্ট অথচ সে রোজ ১০ থেকে ১২ গ্রাম খাবার লবণ খায়।

সাবের বিস্মিত হয়ে বলল, মনে পড়েছে।

লোকটি বলল, জানতাম মনে পড়বে।

সাবের বলল, আপনাকে ইন্টারেস্টিং মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

'আপনাকেও ইন্টারেস্টিং মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটা ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন? ইংরেজী কবিতার দু'টা লাইনের সুন্দর বাংলা করে দেবেন —

''Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land.''

সাবের তৎক্ষণাৎ বলল,

"মনে রেখ যখন চলিয়া যাব দূরে
নৈঃশব্দের দূর নগরীতে।"

লোকটি বলল, বাহ্ সুন্দর তো। সাবের খানিকটা হকচকিয়ে গেল। চট করে তার মাথায় এমন সুন্দর দু'টা লাইন কি করে এল, সে বুঝতে পারছে না। লাইন দু'টা মাথা থেকে চলে যাচ্ছে না — ঘুরপাক খাচ্ছে। আপনা আপনি অন্য রকম করে সাজানো হচ্ছে —

যখন চলিয়া যাব দূরে
বহু দূরে। নৈঃশব্দের দূর নগরীতে —

তিনবার দূর শব্দটা ব্যবহার করায় মনে হচ্ছে অনেক অনেক দূরের কোন জায়গার কথা বলা হচ্ছে। মানুষের চিন্তা এবং কল্পনার বাইরের কোন নগরী, যে নগরী অস্পষ্ট এবং রহস্যময়।

সাবের বলল, আপনার পাশে বসি খানিকক্ষণ?

'বসুন। বৃষ্টিতে ভিজে আবার অসুখ করবে না-তো? ভাইরাস যদি ধরে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেসপিরেটরী ট্র্যাক্ট ইনফেকশন।'

'ধরুক। ক'দিন আর বাঁচব। মরতে তো হবেই তাই না? যেতে হবে অনেক দূরের দেশে। দূরে, বহু দূরে, নৈঃশব্দের দূর নগরীতে।'

সাবের বসল তার পাশে। দু'জনই বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। মিতু জানালা থেকে পুরো ব্যাপারটা দেখছে। সে মনে মনে বলল, পাগলে পাগলে খুব মিল হয়েছে। মিতুর খুব হাসি পাচ্ছে। সে হেসে ফেলল। খিল খিল হাসি। মিস্টার জুলাই হাসির শব্দ শুনে তাকাল মিতুর দিকে। মিতুর আরো বেশী বেশী হাসি আসছে।

জুবায়ের আসতে আসতে রাত দশটা বাজিয়ে ফেলল।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। দু'একটা তারাও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।

জুবায়ের এষার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, সরি। সময়মতই রওনা হচ্ছিলাম। গাড়িতে উঠতে যাব — এক গেস্ট এসে উপস্থিত। এমন গেস্ট যে বলা যায় না — ভাই এখন যান জরুরী কাজে যাচ্ছি।

এষা বলল, এত সাফাই গাচ্ছ কেন? জরুরী কাজ তো কিছু না।

জুবায়ের বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলল, দু'জন এক সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজব এটা জরুরী না? কি বলছ তুমি? স্নান করব নীপ বনে, ছায়াবীথি তলে — এটা যদি

জরুরী না হয় তাহলে .....

'তুমি কি খেয়ে এসেছ?'

'না।'

'ভাল করেছ। এক সঙ্গে খাব। তুমি কি এখনি খাবে? খাবার গরম করতে বলব?'

'বল। এই ফাঁকে আমি চট করে তোমার মাতৃদেবীর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'প্লীজ এখন মা'কে বিরক্ত করো না। মা'র মাথা ধরেছে। মা দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। এখন গেলেই মা রাগ করবেন।'

'পৃথিবীর কেউ আমার উপর রাগ করতে পারে না।'

'মা পারে। এখন তুমি মা'র ঘরে ঢুকলে মা তোমাকে ধমক দিয়ে বের করে দেবে — এটা ভাল হবে? তারচে, চল খাওয়া-দাওয়া করা যাক।'

রাতের খাবার শেষ করে জুবায়ের সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, চল ছাদে যাই। ছাদে হাঁটাহাঁটি করে আসি। আফটার ডিনার ওয়াক-এ মাইল।

এষা বলল, পাগল এখন ছাদে যাব কি? বৃষ্টিতে ছাদ পিছল হয়ে আছে।

জুবায়ের খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেল।

এষা বলল, পান খাবে? পান এনে দেব?

'না।'

'কি ব্যাপার তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?'

জুবায়ের বলল, তোমার ব্যাপারে আমার একটা অবজারভেশন আছে। তুমি কোন নির্জন জায়গায় আমার সঙ্গে থাকতে চাও না। এক ধরনের অস্বস্তি বোধ কর। এর কারণ কি বল তো? একজন মৌলানার সামনে তিনবার কবুল বলিনি — এই কি কারণ?

এষা বলল, কি বলছ এসব? হয়েছে কি তোমার? ছাদে যেতে চাচ্ছি না কারণ ছাদ পিছল হয়ে আছে। তারপরেও তুমি যদি যেতে চাও — খুব ভাল কথা। চল যাই — পা পিছলে কোমর ভাঙ্গলে কিন্তু আমাকে দোষ দেবে না।

জুবায়ের বলল, যেদিন ছাদ শুকনো থাকে সেদিনও কিন্তু যেতে চাও না। গত সপ্তাহের কথা কি তোমার মনে আছে? তোমাকে বললাম, চল ছাদে যাই। তুমি বললে — তুমি যাও আমি আসছি। আমি অপেক্ষা করছি। তুমি এলে ঠিকই, মিতুকে সঙ্গে নিয়ে এলে।

এষা বিরক্ত গলায় বলল, মিতু আমার সঙ্গে আসতে চাচ্ছিল। আমি কি

করব? মিতুকে বলব — না তুমি যেতে পারবে না। আমাকে একা-একা যেতে হবে যাতে অন্ধকারে ঐ লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরতে পারে। লোকটাকে এই সুযোগ দিতে হবে কারণ দু'দিন পর সে আমাকে বিয়ে করছে।

'তুমি রেগে যাচ্ছ এষা।'

'সরি।'

'আশ্চর্য! তুমি এত চট করে রেগে যাও। দেখি একটা পান দাও তো খাই।'

এষা পান এনে দিল।

জুবায়ের দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আচ্ছা ঐ লোকের খবর কি? তার বাড়িঘরের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?

'না।'

'সারাদিন সে করে কি?'

'কিছুই করে না। আজ সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টিতে ভিজেছে পুরো চারঘণ্টা।'

'খুবই সন্দেহজনক।'

'সন্দেহজনক কেন?'

'সে যে একটা অদ্ভুত কিছু এইটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে বিরাট ফ্রড। তোমাদের সাবধান থাকা উচিত।'

'আমার মনে হয় না সে ফ্রড। বরং আমার মনে হয় একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।'

'ইয়ং লেডি ফর ইওর ইনফরমেশন — পৃথিবীতে ফ্রড মাত্রই ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার হয়। বিরক্তিকর কোন মানুষ ফ্রড হতে পারে না। আমি লোকটার সঙ্গে আলাপ করে আসি। আশা করি জেগে আছে। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে? এষা না-সূচক মাথা নাড়ল। জুবায়ের একাই রওনা হল।'

মিস্টার জুলাই জেগে ছিল। বিছানায় বসে গভীর মনোযোগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফী পত্রিকার পাতার দিকে তাকিয়ে আছে।

জুবায়ের ঘরে ঢুকেই বলল, কেমন আছেন?

'জ্বি ভাল।'

'আমার নাম মোহম্মদ জুবায়ের। আপনার নাম কি জানতে পারি।'

'আমার নাম জুলাই। তিনদিন পর নাম বদল হবার সম্ভাবনা আছে। বসুন।'

'বসব না — দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'জিজ্ঞেস করুন। তবে আমার মনে হয় আপনার বেশীর ভাগ প্রশ্নেরই জবাব

দিতে পারব না।'

'জবাব দিতে পারবেন না এমন কোন প্রশ্ন আমি আপনাকে করব না। তবে ইচ্ছা করে জবাব না দিলে তো কিছুই করার নেই।'

'আমি যা জানি আপনাকে বলব। অবশ্যই বলব।'

'পাগল সাজার চেষ্টা করছেন কেন?'

'কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'শুনলাম চারঘন্টা বৃষ্টিতে ভিজেছেন। আপনার এই কাজের পেছনে পাগল সাজার সূক্ষ্ম চেষ্টা লক্ষ্য করছি। কারণটা জানতে চাচ্ছি।'

মিস্টার জুলাই শান্ত গলায় বলল, আপনি বোধ হয় একটা জিনিস জানেন না — পাগলরা কখনো বৃষ্টিতে ভিজে না। পানি আর আগুন — এই দু'টা জিনিসকে পাগলরা ভয় পায়। এই দু'টা জিনিস থেকে এরা অনেক দূরে থাকে। কখনো শুনবেন না — কোন পাগল পানিতে ডুবে মারা গেছে বা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জুবায়ের প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল, আপনি কি সিগারেট খান?

'না।'

'একটা খান আমার সঙ্গে। খেয়ে দেখুন কেমন লাগে।'

লোকটা সিগারেট নিল। আগুন ধরিয়ে টানতে লাগল। জুবায়ের বলল, আপনার কয়েকটা জিনিস আমি মিলাতে পারছি না। দুয়ে দুয়ে চার হচ্ছে না। আপনি বলছেন আপনার আগের কথা কিছুই মনে নেই। স্মৃতি-বিলুপ্তি ঘটেছে। অথচ পাগল পানি এবং আগুন ভয় পায় এটা মনে আছে। একটা মনে থাকবে, একটা থাকবে না তা কেমন করে হয়।

লোকটা জবাব দিল না। নিজের মনে সিগারেট টানতে লাগল।

জুবায়ের চলে যাবার আগে এষাকে বলে গেল — সাবধান থাকবে। খুব সাবধান। খুবই সন্দেহজনক ক্যারেকটার। তোমার বাবাকে বলবে — অতি দ্রুত তিনি যেন লোকটাকে ডিসপোজ করার ব্যবস্থা করেন। লোকটার কোন একটা বদ মতলব আছে।

এষা হাসতে হাসতে বলল, তোমার কি ধারণা — কি করবে সে? গভীর রাতে আমাদের খুন করে পালিয়ে যাবে?

'বিচিত্র কিছু না। করতেও তো পারে।'

'লোকটাকে দেখে খুনী খুনী মনে হয় না।'

'ফর ইওর ইনফরমেশন ইয়াং লেডি — খুনীদের আলাদা কোন চেহারা হয় না।'

'ফর ইওর ইনফরমেশন ইয়াং ম্যান — রাত পৌনে বারটা বাজে — তোমার এখন চলে যাওয়া উচিত।'

'আমি যাচ্ছি — কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি — বি কেয়ারফুল, নেভার ট্রাস্ট এ স্ট্রেঞ্জার।'

সুরমা খেতে বসেছেন। খাবার ঘরে শুধু তিনি এবং মতিন সাহেব। সুরমা খাবার সময় কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। কেউ কথা বললে, এমনভাবে তাকান যেন বিরক্ত হচ্ছেন। মতিন সাহেব বললেন, মাথাব্যথা কমেছে?

সুরমা তাঁর দিকে না তাকিয়েই বললেন, না।

'রোজ রোজ মাথা ধরে এটা তো ভাল কথা না। একজন ডাক্তার দেখাও। সাধারণত চোখের কোন প্রবলেম হলে মাথা ধরে। তোমার কি চোখের কোন সমস্যা আছে।'

'জানি না, থাকতে পারে।'

'কাল আমার সঙ্গে চল — আমার চেনা একজন চোখের ডাক্তার আছেন।'

'কাল আসুক তখন দেখা যাবে।'

সুরমা উঠে পড়লেন। প্লেটে খাবার পড়ে আছে। অল্প কিছু মুখে দিয়েছেন। তাঁর বমি বমি আসছে। বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বললেন, তোমার ঐ লোকের কোন গতি করতে পারলে?

'না।'

'সে-কি স্থায়ীভাবে এই বাড়িতেই থাকবে?'

'না — তা কেন। কয়েকটা দিন দেখে — বিদেয় করে দেব।'

'মিতু ওর সঙ্গে মাখামখি করে, আমার এটা পছন্দ না।'

'মিতুকে নিষেধ করে দিও।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা কেউ আমার কথা শুনে না — ওদের কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। হরিপ্রসন্ন বাবু এসেছেন, জান?'

'এষা বলেছে।'

'কি জন্যে এসেছেন তা জান?'

'না।'

সুরমা কঠিন মুখে বললেন, কোথাও থাকার জায়গা নেই বলে এসেছেন। তাঁর ধারণা তিনি অল্প কিছুদিন বাঁচবেন। সেই অল্প কিছুদিন — এই বাড়িতে থাকতে চান।'

'তুমি না করে দিয়েছ তো?'

'আমি না করব কেন? অপ্রিয় কাজগুলি তুমি সব সময় আমাকে দিয়ে করাতে চাও। এটা ঠিক না। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তুমি বলবে।'

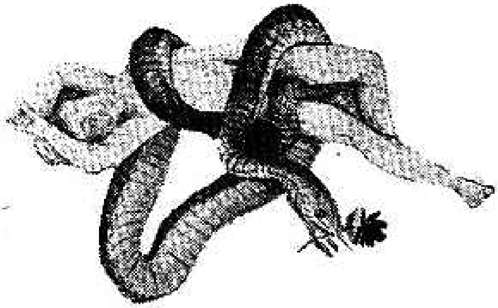

হরিপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে মতিন সাহেবের যোগাযোগের একমাত্র সূত্র হচ্ছে — মতিন সাহেবের বড় মেয়ে নিশা। হরিবাবু নিশাকে কিছুদিন অংক শিখিয়েছেন। নিশার কোন শিক্ষকই বেশীদিন পছন্দ হয় না। তাঁকেও পছন্দ হয় নি। সে দু'মাস অংক করেই বলল, বাবা উনাকে বদলে দাও।

মতিন সাহেব বলেছিলেন, কেন মা? এত ভাল টিচার . . .

নিশা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, উনি কেমন করে জানি তাকান আমার ভাল লাগে না। মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কেমন করে তাকান?

'আমি তোমাকে বলতে পারব না।'

মতিন সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি হরিবাবুকে ছাড়িয়ে দিলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে হরিবাবু কখনো কোন বিশেষভাবে নিশার দিকে তাকান নি। তাঁর মুখে মা-জননী ছাড়া অন্য কোন ডাকও ছিল না। ষাট বছর বয়েসী একজন বৃদ্ধ ক্লাস টেনের একটা বাচ্চা মেয়ের দিকে বিশেষ ভঙ্গিতে তাকানোর প্রশ্নও উঠে না। সেই সময় নিশার ধারণা হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর সব পুরুষই তার দিকে বিশেষভাবে তাকায়। তার সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করে।

হরিবাবু চলে গেলেও তিনি এই বাড়িতে আসা-যাওয়া বন্ধ করেন না। প্রায়ই দেখা যায় বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। নিশাকে খবর পাঠাতেন। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলতো — আমি যেতে পারব না। কেন আসে শুধু শুধু। ভদ্রলোককে অনেকক্ষণ একা বসে থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত নিশা অবশ্যি আসত। শুধু আসতো না — হাসি মুখে অনেকক্ষণ গল্প করত।

হরিবাবুর নিকট বা দূর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। স্ত্রী মারা গেছেন যৌবনে বিয়ের এক বছরের মাথায়। দুই ভাই পার হয়ে গেছেন ইন্ডিয়ায়। তিনি বাসাবো এলাকায় টিনের দু' কামরার একটা ঘরে কুড়ি বছর একাই কাটিয়ে দিয়েছেন। ফরিদা বিদ্যায়তনের শিক্ষক ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর ভয়াবহ সমস্যায় পড়ে গেলেন। প্রাইভেট স্কুল। পেনসনের ব্যবস্থা নেই। প্রাভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাও পুরোটা পেলেন না। যা পেলেন তাও দ্রুত শেষ হয়ে গেল। গৃহশিক্ষকতা করার ক্ষমতা নেই। ছাত্র-ছাত্রী কেউ আসেও না। বয়সের নানান আদি ব্যাধিতে পুরোপুরি কাবু হয়ে গেলেন। একমাত্র কাজ দাঁড়াল পুরানো ছাত্র-ছাত্রীকে খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে কিছুদিন করে থাকার ব্যবস্থা করা যায় কি না সেই চেষ্টা করা। বাসাবোর বাড়িটি ছ'মাস আগে ছেড়ে দিয়েছেন। বাসা ধরে রাখার কোন অর্থও নেই। তাঁর হাত শূন্য। অর্থ এবং বিত্তের মধ্যে আছে তাঁর স্ত্রীর কানের একজোড়া দুল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে দুলজোড়া তিনি নিজের হাতে স্ত্রীর কান থেকে খুলে রেখেছিলেন।

মতিন সাহেবের বাড়িতে তিনি খুব ভয়ে ভয়ে এসে উঠেছেন। এখনো মতিন সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। কয়েকটা দিন এই বাড়িতে থাকতে চান। এই প্রসঙ্গে মতিন সাহেবের সঙ্গে কিভাবে আলাপ করবেন তা অনেকবার মনে মনে ভেবে রেখেছেন। সমস্যা হচ্ছে বয়সের কারণেই বোধ হয় ভেবে-রাখা কথা তিনি কখনো ঠিকমত বলতে পারেন না। তাছাড়া মতিন সাহেব লোকটিকেও তিনি ভয় পান। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে অর্থ ও বিত্তবান সব মানুষকেই তিনি ভয় করা শুরু করেছেন।

হরিবাবু বারান্দায় বসেছিলেন।

এষা তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। বসার ঘরে মতিন সাহেব তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। হরিবাবু মনে মনে গীতার শ্লোক বলতে লাগলেন —

"তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

হে ঈশ্বর, আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে অ-মৃত্যুতে।

মতিন সাহেব বললেন, বসুন।।

হরিবাবু বসলেন।

'শুনলাম, কিছুদিন এখানে থাকতে চান?'

'জ্বি।'

'ব্যাপারটা কি?'

হরিবাবু ভেবে-রাখা কথা দ্রুত মনে করার চেষ্টা করলেন। কোন কিছুই মনে পড়ল না। নিজের অভাবের কথা বলতে পারলেন না। মাথার ভেতর গীতার শ্লোক ঘুরতে লাগলো —

"তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

'কতদিন থাকতে চান?'

'এই অল্প ক'টা দিন। আমার আয়ু শেষ। যাওয়ার জায়গা নাই।'

'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

'খুড়তোতো এক ভাই থাকে পাটনায় — তার ঠিকানা জানি না।'

'আমি বরং আপনাকে কিছু অর্থ সাহায্য করি। একজন মানুষকে রাখার অনেক সমস্যা। বুঝতেই পারছেন।'

হরিবাবু বিড় বিড় করে গীতার শ্লোক বললেন। মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন — এসব কি বলছেন?

'গীতার একটা শ্লোক। বয়স হয়ে গেছে — এখন ঠিকমত কিছু ভাবতেও পারি না — বলতেও পারি না। আপনাকে আমি বেশীদিন যন্ত্রণা দেব না, কয়েকটা দিন। আমার প্রতি দয়া করুন। আমি রোজ সকালে উঠে ঈশ্বরের কাছে — মৃত্যু প্রার্থনা করি —। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমার সময় আগতপ্রায়।'

'ঈশ্বর প্রার্থনা শুনেছেন তা কি করে বুঝলেন?'

'এটা বোঝা যায়।'

মতিন সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন — আচ্ছা থাকুন।

'আপনি কি আমাকে থাকতে বললেন?'

'হ্যাঁ বললাম।'

মতিন সাহেব এষাকে বলেছিলেন — ঐ লোকটার ঘর হরিবাবুকে দিয়ে দে।

এষা বললো, মিস্টার জুলাই এর ঘর? সে তো এখনো যায় নি।

'ঐ ঘরে আরেকটা খাট দিয়ে দে, তা হলেই তো হল। প্রত্যেকের আলাদা ঘর লাগবে না-কি?'

হরিবাবু বললেন, আপনি আমাকে কিছু বললেন?

'না। আপনাকে কিছু বলিনি।'

হরিবাবুর জায়গা হল মিস্টার জুলাই এর সঙ্গে। প্রথম রাত আনন্দে তিনি ঘুমুতে পারলেন না।

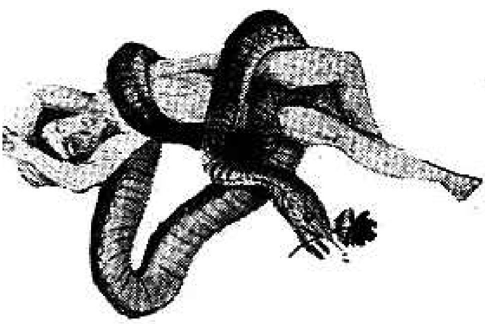

মিতু বলল, আজ থেকে তোমার নাম মিস্টার আগস্ট।

লোকটি হাসল। মিতু বলল, তোমার খুশী লাগছে না? নতুন নাম পেয়ে গেছ।

'হ্যাঁ খুশী লাগছে। খুব খুশী। বৎসরে বারটা নাম ঘুরে ঘুরে আসবে। তার চেয়েও ভাল হত যদি এক দুই তিন চার এইভাবে নাম রাখা হত। যেমন যেদিন একটা শিশুর জন্ম হল সেদিন তার নাম এক, পরের দিন তার নাম দুই, তার পরের দিন তিন। এইভাবেই চলতে থাকবে। প্রতিদিন নতুন নাম। এতে অনেক সুবিধা।'

'কি সুবিধা?'

'কেউ যখন তার নাম বলবে সঙ্গে সঙ্গে তুমি বুঝবে এই পৃথিবীতে সে কতদিন বাঁচল। এটা জানা থাকা খুব দরকার।'

'দরকার কেন?'

'দরকার এই জন্যে যে নাম শোনামাত্র তুমি বুঝবে এই পৃথিবীতে সর্বমোট কতগুলি সূর্যাস্ত তুমি দেখেছো।'

মিতু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ব্যাপারটা তার ভাল লাগছে। সে নিজের নামটা বদলে ফেলবে কি–না ভাবছে। বদলে ফেললে হয়। কেউ আবার রাগ করবে না তো?

মিস্টার আগস্ট মিটি মিটি হাসছে। মিতু বলল, আপনি হাসছেন কেন?

'তুমি তোমার নাম বদলে ফেলতে চাচ্ছ এই জন্যে হাসছি।'

'কে বলল আপনাকে নাম বদলাতে চাচ্ছি?'

'কে কি ভাবছে তা আমি অনুমান করতে পারি। তুমি তোমার জন্ম তারিখ বল, আমি ঠিক করে দেব তোমার নাম কি হবে।'

'আমার জন্ম ১১ মার্চ।'

'কোন সনে জন্ম সেটা বল।'

মিতু বলল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই বলল, তোমার নাম হল তিন হাজার ছয়শ' চুয়ান্ন।

'আগামীকাল আমার নাম হবে তিন হাজার ছয়শ' পঞ্চান্ন।'

'হ্যাঁ।'

মিতু নতুন নামের আনন্দ চোখে মুখে নিয়ে ঘর থেকে বেরুল। সবাইকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। বাসার সবাইকে তো জানাবেই, স্কুলের বন্ধুদেরও জানাতে হবে। আজ ছুটির দিন হয়ে মুশকিল হয়ে গেছে। ছুটির দিন না হলে সব বন্ধুদের এক সঙ্গে বলা যেত। এখন বলতে হবে টেলিফোনে। ভাগ্যিস তার একটা টেলিফোন বই আছে। সেই বই–এ সে সবার টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখেছে। অবশ্যি যাদের সঙ্গে ঝগড়া হয় তাদের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার কেটে দেয়। ঝগড়া মিটমাট হলে আবার লেখে।

মিতু তার টেলিফোনের বই নিয়ে বেশ কিছু টেলিফোন করল — 'হ্যালো শমি — আমি মিতু। কেমন আছিস ভাই?'

'ভাল।'

'আজ থেকে আমি আমার নাম বদলে ফেলেছি — এখন আমার নাম তিন হাজার ছয়শ' চুয়ান্ন।'

'ধ্যাৎ'

'ধ্যাৎ না। সত্যি। আগামীকাল আমার বয়স হবে তিন হাজার ছয়শ' পঞ্চান্ন। আমার যতদিন বয়স — সেটাই আমার নাম। এতে সুবিধা কি জানিস? এতে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে এ জীবনে আমি ক'টা সূর্যাস্ত দেখেছি।'

'মিতু তুই পাগলের মত কথা বলছিস কেন? তোর কি জ্বর হয়েছে?'

মিতু বলে তুই আমাকে আর ডাকবি না ভাই। আমার যা নাম তাই ডাকবি — তিন হাজার ছয়শ' চুয়ান্ন। আচ্ছা ভাই রাখলাম।'

মিতু সব মিলিয়ে চারটা টেলিফোন করল। পঞ্চমটা করতে যাচ্ছে, তখন মতিন সাহেব তাকে কাছে ডাকলেন। হাসিমুখে বললেন, হচ্ছে কি মিতু? মিতু লজ্জিত গলায় বলল, কিছু না বাবা।

'টেলিফোনে কি বলছিস? আমি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে শুনলাম। যদিও অন্যের টেলিফোন কনভারসেশন শোনা খুবই অনুচিত। মনের ভুলে শুনে ফেলেছি। তুমি কি বলছ বন্ধুদের?'

'এখন থেকে আমার নতুন নাম বাবা। একেকটা দিন আসবে আমার নাম বদলে যাবে।'

'এই বুদ্ধি কার?'

'মিস্টার আগস্ট আমাকে বলেছেন।'

মতিন সাহেবের মুখ একটু যেন গম্ভীর হল। মুখের গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে বললেন — আচ্ছা ঠিক আছে। এষাকে বল আমাকে চা বানিয়ে দিতে। মিতু চায়ের কথা বলতে গেল। মতিন সাহেব খবরের কাগজ হাতে লোকটার খোঁজে গেলেন। সে ঘরে নেই। কাঁঠাল গাছের নীচে বসে আছে। মতিন সাহেব মন্টুর ঘরে উঁকি দিলেন। সকাল এগারোটা বাজে। মন্টুর ঘুম ভেঙ্গেছে। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দাঁত ব্রাশ করছে। কেউ বিছানায় শুয়ে ব্রাশ করতে পারে তা তার ধারণার বাইরে ছিল। মন্টু দুলাভাইকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

'দুলাভাই কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে দাঁত মাজ এটা জানতাম না।'

'এটা নতুন শুরু করেছি দুলা ভাই। রাতে শোবার আগে টুথপেস্ট লাগিয়ে মাথার কাছে রেখে দেই। দাঁত-টাত মেজে একেবারে ফ্রেশ হয়ে বিছানা থেকে নামি।'

'ভাল।'

'কি বলতে এসেছেন দুলাভাই?'

'তুমি ঐ লোকটাকে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসতে পারবে? কোন খোঁজ তো পাওয়া যাচ্ছে না — আর কতদিন রাখব। সে যে নিজ থেকে চলে যাবে তারও লক্ষণ দেখছি না।'

'আমি বরং এক কাজ করি। লোকটাকে কড়া করে বলি, গেট আউট। মামদোবাজি শুরু করেছ? পরের বাড়িতে খাচ্ছ-দাচ্ছ ঘুমুচ্ছ। স্টপ ইট, বিদায় হও।'

'এসব বলার কোন দরকার নেই। লোকটাকে যেখান থেকে তুলে এনেছিলাম সেখানে রেখে এসো। গাড়ি নিয়ে যাও। আরেকটা কথা — লোকটাকে না জানানো ভাল যে, তুমি তাকে রেখে আসতে যাচ্ছ।'

'জানলে অসুবিধা কি?'

'লোকটার আজ যে এই অবস্থা তার জন্যে আমি নিজেকে দায়ী মনে করছি। আমার মধ্যে অপরাধবোধ আছে।'

'আপনি যা বলবেন তাই করব দুলাভাই। বিড়ালের বাচ্চা যেমন ছেড়ে দিয়ে আসে — ঠিক তেমনি ছেড়ে দিয়ে আসব। ব্যাটা আবার গন্ধ শুঁকে চলে না আসে।'

মতিন সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন, যা করবে চুপচাপ করবে। বাসার কাউকে কিছু জানানোর দরকার নেই। বিশেষ করে মিতু যেন কিছু না জানে।

'কেউ কিছু জানবে না দুলাভাই। আমার উপর বিশ্বাস রাখেন। রাতের অন্ধকারে মাল পাচার করে দেব।'

এষা দোতলার বারান্দা থেকে দেখল লোকটা কাঁঠাল গাছের নীচে মোটা একটা বই নিয়ে বসে আছে। কি বই এত মন দিয়ে পড়ছে? একবার ভাবল নীচে নেমে জিজ্ঞেস করবে, পর মুহূর্তেই মনে হল — কি দরকার। এষা সাবেরের ঘরে ঢুকল। তিনদিন ধরে সে জ্বরে ভুগছে। লোকটার সঙ্গে সে ঘন্টাখানিক বৃষ্টিতে ভিজেছিল। লোকটার কিছু হয়নি। তার ঠাণ্ডা লেগে গেল। সেখান থেকে হল টনসিলাইটিস। এখন বুকে ব্যথা করছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এষা বলল, শরীর কেমন দাদা? সাবের বিরস মুখে বলল, সুবিধার মনে হচ্ছে না। গায়ে টেম্পারেচার আছে। ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে নিউমোনিয়ায় টার্ন নেবে।

'ডাক্তার ডাকাও। ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাও।'

'ডাক্তার কি ডাকব। আমি নিজেই ডাক্তার না?'

'বেশ তুমি নিজেই প্রেসক্রিপশন লিখে অষুধ আনাও। অষুধ এনে খাও।'

'খাব। একটু টাইম নিচ্ছি। দেখছি।'

'কি দেখছ?'

'অসুখটা কোন দিকে টার্ন নিচ্ছে তাই দেখছি। মিস্টার আগস্ট আমাকে বলেছেন, কোন অসুখ সম্পর্কে পুরোপুরি জানার একটাই উপায় — অসুখটা নিজের হওয়া। এখন চট করে অষুধ খেয়ে রোগ সারিয়ে ফেললে আমি জানব কি?'

'মিস্টার আগস্ট এখন তোমাকে ডাক্তারী শেখাচ্ছেন?'

'তা না, শিখতে সাহায্য করছেন। সাহায্যটা আমার খুব কাজে আসছে।'

'সাহায্য করার এই তো নমুনা — সবগুলি অসুখ নিজের হতে হবে।'

'তা ঠিক।'

'ক্যান্সার সম্পর্কে জানার জন্যে তাহলে তো ক্যান্সার হওয়া দরকার।'

'অবশ্যই দরকার।'

'তোমার শিক্ষাগুরু মিস্টার আগস্ট কি বিনা পয়সায় তোমাকে শিখাচ্ছেন না যৎকিঞ্চিৎ ফি নিচ্ছেন?'

'ফি–টি কিছু না। ইন-রিটার্ন আমি উনাকে ইংরেজী শেখাচ্ছি। তাঁর স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। দ্রুত শিখে ফেলেছেন। এখন উনাকে বলেছি শব্দভাণ্ডার বাড়াতে। ডিকশনারী মুখস্থ করতে বলেছি।'

'ডিকশনারী মুখস্থ করতে বলেছ?'

'হ্যাঁ। আমার যেমন স্মৃতিশক্তি বলে কিছু নেই উনার আবার উল্টো ব্যাপার। অসম্ভব ভাল স্মৃতিশক্তি। এর কারণও খুঁজে বের করেছি।'

'কি কারণ?'

'কারণ হল উনার আগের কোন স্মৃতি নেই। ব্রেইনের মেমোরী সেল সব খালি। সেই খালি জায়গাগুলিতে উনি ইনফরমেশন ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছেন।'

এষা উঠে দাঁড়াল। সাবের বলল, তুই একটা কাজ করবি এষা, উনাকে এখানে পাঠাবি?

এষা অবাক হয়ে বলল, এখানে? বাইরের একজন মানুষকে তুমি দোতলার শোবার ঘরে নিয়ে আসবে?

'উনি তো আসেন প্রায়ই।'

এষা বিস্মিত হয়ে বলল, প্রায়ই আসেন মানে?

'গভীর রাতে আসেন। তোরা সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকিস তখন আসেন। গল্প–গুজব করি। কাল রাতে তিনটার দিকে এসেছিলেন।'

'দাদা শোন, আর কখনো তুমি তাঁকে এখানে আসতে বলবে না। কখনো না।'

'তুই রাগ করছিস কেন? চমৎকার একজন মানুষ . . .'

'চমৎকার মানুষ হোক আর না হোক। তুমি তাকে আসতে বলবে না।'

'আমি আসতে বলি না তো। উনি নিজে নিজেই চলে আসেন।'

'নিজে নিজেই চলে আসেন? কি বলছ তুমি এসব?'

'আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুই নিজেই উনাকে জিজ্ঞেস করে আয়।'

এষা নীচে নেমে গেল। মনে মনে ঠিক করে রাখল কঠিন কিছু কথা বলবে। বাড়ি থেকে চলে যেতেও বলবে। মনে হচ্ছে এই লোকটা সমস্যা সৃষ্টি করবে। হয়তো ইতিমধ্যে করেও ফেলেছে। মিতু বলছে তার নাম, তিন হাজার ছয়শ' চুয়ান্ন। এই নামে না ডাকলে সে কথা বলছে না। এসবের কোন মানে হয়?

এষাকে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াল। তার হাতে সত্যি সত্যি একটা ডিকশনারী — সংসদ, ইংলিশ টু বেঙ্গলী অভিধান। লোকটা বলল, কেমন আছেন?

এষা কঠিন মুখে বলল, ভাল।

'আপনি মনে হচ্ছে আমার উপর রাগ করেছেন।'

'রাগের ব্যাপার না। আপনার সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

রাগ নিয়ে কথা বললে কথাগুলি গুছিয়ে বলতে পারবেন না। রাগ দূর করে কথাগুলি বলুন। কথা বলা শেষ হবার পর আবার রাগ করুন।'

'তা-কি সম্ভব?'

'অবশ্য সম্ভব। আচ্ছা আমি বরং আপনার রাগ কমানোর ব্যাপারে সাহায্য করি। আমি এমন কিছু বলি যাতে আপনার রাগ কমে যায়।'

'বলুন।'

'আমি এই ডিকশনারীটা মুখস্থ করে ফেলেছি।'

এষা বিরক্ত গলায় বলল, আপনি ডিকশনারী মুখস্থ করেছেন খুবই ভাল কথা। এতে আমার রাগ কমবে কেন?

'ডিকশনারী মুখস্থ করেছি আপনার জন্য।'

'আমার জন্য মানে?'

'আমি ইংরেজী জানি না শুনে আপনার মন খারাপ হয়েছিল। তখনি আমি ঠিক করলাম — ইংরেজী শিখব। আপনাকে খুশী করব। আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি আপনি খুশী হয়েছেন। এখন বলুন কি বলতে চান। এখানে বসুন, তারপর বলুন।'

'আপনি মিতুর নাম বদলে দিয়েছেন?'

'আমি বদলাইনি। সে নিজের আগ্রহেই বদলেছে।'

'আপনার ধারণা সংখ্যা দিয়ে নামের এই আইডিয়া একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'সমস্যাগুলি ভেবে দেখেছেন? সবার হবে এক রকম নাম . . . ।'

'এটাই কি ভাল না? সব মানুষ তো আসলে এক। আমরা নানানভাবে একজন মানুষকে অন্যের থেকে আলাদা করি। তার ভিন্ন ভিন্ন নাম দেই। সংখ্যাবাচক নাম হলে আমরা বুঝব মানুষ আসলে একই রকম। শুধু সংখ্যার বেশ-কম।'

এষা খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ কোন যুক্তি তার মনে এল না। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, নাম মনে রাখাও একটা সমস্যা হবে। ধরুন, মিতুর সঙ্গে দশদিন আপনার দেখা হল না। তার নাম এই দশদিনে পাল্টে গিয়ে হল তিন হাজার ছয়শ' চৌষট্টি। আপনার মনে থাকবে?

'থাকা উচিত। যে মনে রাখতে পারবে না বুঝতে হবে তার মনে রাখার প্রয়োজন নেই।'

'আপনি খুবই অদ্ভুত কথা বলছেন। এইসব কথাবার্তার একটিই উদ্দেশ্য। আপনি আমাদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছেন। ঠিক করে বলুন তো আপনি কে?'

'আমি মিস্টার আগস্ট।'

'প্লীজ দয়া করে বলুন আপনি কে?'

লোকটা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

এষা শান্ত গলায় বলল, গভীর রাতে আপনি দাদার ঘরে যান। কেন যান?

'ও আমাকে ডাকে — তাই যাই।'

'যে আপনাকে ডাকবে আপনি তার কাছেই যাবেন?'

'হ্যাঁ?'

'আপনি কে বলুন তো? সত্যি করে বলুন তো আপনি কে?'

'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন আমি জানি না।'

'আপনি নিশ্চয়ই দাবী করেন না যে আপনি একজন দেবদূত। আকাশ থেকে পড়েছেন।'

'কি যে বলেন। দেবদূত হতে যাব কেন?'

এষা গলার স্বর নামিয়ে বলল, সায়েন্স ফিকশানের কোন ক্যারেক্টার না তো?

'আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না।'

'সায়েন্স ফিকশানে এরকম প্রায়ই পাওয়া যায় — ভবিষ্যতের একজন মানুষ টাইম মেশিনে করে অতীতে চলে এসেছেন — আপনি তেমন কেউ না তো? ম্যান ফ্রম দ্যা ফিউচার?'

'না — তা না। তবে . . . '

'তবে কি?'

'হলে মন্দ হত না।'

লোকটি মুখ টিপে হাসল। সে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। তার চোখ কালো। তবু কালো চোখেও কোথায় যেন — নীলচে ভাব আছে।

এষার কেন জানি ভয় ভয় করতে লাগল। যদিও সে জানে ভয়ের কোনই কারণ নেই। কাঁঠাল গাছের নীচে বসে থাকা লোকটি আধা পাগল ধরনের মানুষ। এই ধরনের মানুষ নিজস্ব ভঙ্গিতে কিছু কথাবার্তা বলে। যেসব কথাবার্তা সাধারণ মানুষের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়।

'এষা'

'জ্বি।'

'তুমি কি একটু পরীক্ষা করে দেখবে আমি ডিকশনারীটা পুরোপুরি মুখস্থ করতে পেরেছি কি–না।'

'আপনি আমাকে তুমি করে বলছেন কেন?'

'আচ্ছা আর বলব না। আপনি কি দয়া করে দু'একটা কঠিন ইংরেজী শব্দ জিজ্ঞেস করবেন — আমি দেখতে চাই ডিকশনারী মুখস্থ করতে পারলাম কি–না।'

এষা কিছু না বলে উঠে চলে গেল। লোকটা আবার ডিকশনারী খুলে বসল। তার গায়ে চৈত্র মাসের কড়া রোদ এসে পড়েছে। সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপও নেই। ঘন্টাখানিক এইভাবেই পার হল। তখন মন্টুকে শিস্ দিয়ে আসতে দেখা গেল। সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, ব্রাদার কি করছেন?

'কিছু করছি না।'

'রোদে তো ভাজা ভাজা হয়ে গেলেন। চলুন ঘুরে আসি।'

'কোথায়?'

'আরে ব্রাদার চলুন না। গাড়ি করে যাব। গাড়ি করে ফিরে আসব। গায়ে হাওয়া লাগবে।'

'চলুন।'

'আপনার সঙ্গে আমার এখনো পরিচয় হয়নি। আমার সমস্যা কি জানেন? আমি আগ বাড়িয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে — খুবই ভাল কথা। কথা বলব। সেধে চা খাওয়াব। সিগারেট অফার করব। কেউ নিজের থেকে আমার কাছে না এলে আমি ভুলেও কিছু বলব না।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে মিস্টার আগস্ট বলল, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

মন্টু দরাজ গলায় বলল, চলুন না ভাই — শালবন দেখে আসি। চৈত্র মাসে শালবনের একটা আলাদা বিউটি আছে।

রাস্তা ফাঁকা, গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। লোকটি পেছনের সীটে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। মন্টু খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছে। একটা বিড়াল দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসা এক কথা আর একটা জলজ্যান্ত মানুষ ছেড়ে দিয়ে আসা ভিন্ন কথা। কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে। মন্টু উঁচু গলায় বলল, ব্রাদারের কি ধূমপানের অভ্যাস আছে?

'জ্বি না।'

'বেঁচে গেছেন। অসম্ভব পাজি নেশা। টাকা নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট। আমার দেড় প্যাকেটের মত লাগে। আগে দু' প্যাকেট লাগতো। কমিয়ে দেড় করেছি।'

লোকটি জবাব দিল না। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। মন্টু একের পর এক সিগারেট টেনে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারেনি তার এতটা অস্বস্তি লাগবে।

গাড়ি এসে মৌচাকে শালবনের কাছে থামল। মন্টু ক্ষীণস্বরে বলল, ব্রাদার নামুন।

লোকটা নামল। হাসিমুখেই নামল।

'ব্রাদার আপনার হাতে এটা কি বই?'

'ডিকশনারী।'

'ডিকশনারী নিয়ে ঘুরাঘুরি করছেন। ব্যাপার কি?'

'ডিকশনারীটা মুখস্থ করে ফেলেছি। চর্চার ব্যাপার তো, চর্চা না থাকলে ভুলে যাব। এই জন্যে সঙ্গে সঙ্গে রাখি। সময় পেলেই পাতা উল্টাই।'

'সত্যি মুখস্থ করে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বলেন কি ব্রাদার, আপনি তো মহা-কাবিল লোক। দেখি ডিকশনারীটা দিন তো আমার হাতে।'

লোকটা ডিকশনারী মন্টুর হাতে তুলে দিল। মন্টু পাতা উল্টে বলল, বলুন

তো Meed মানে কি?

'মীড শব্দটার মানে হল পারিশ্রমিক।'

'গুড, হয়েছে। এখন বলুন ম্যালানিন মানে কি?'

'ম্যালানিন হচ্ছে কৃষ্ণকায় জাতির চুলের ও ত্বকের কৃষ্ণবর্ণ।'

'ভেরী গুড। এবার বলুন শেরাটন মানে কি?'

'শেরাটন হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর আসবাবপত্রের অনাড়ম্বর নির্মাণশৈলী।'

'হয়েছে। আমি তো জানতাম শেরাটন হোটেলের নাম। ব্রাদার আপনি তো কাবিল আদমী।'

'কাবিল আদমী ব্যাপারটা কি?'

'কাবিল আদমী হল গ্রেটম্যান। আপনার বয়স অল্প। আরেকটু বেশী বয়স হলে আপনার পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলতাম। অনেস্ট। আপনি তো ব্রাদার সুপারম্যান। আসুন এই গাছটার নীচে বসি। ব্রাদারলি কিছু কথাবার্তা বলি।'

দু'জনে গাছের নীচে বসল। মন্টু বলল, সঙ্গে চা থাকলে ভাল হত। গাছের নীচে বসে চা খেতাম। গ্রেট মিসটেক হয়ে গেছে।

লোকটা বলল, আপনি কি আমাকে এখানে রেখে যেতে এসেছেন?

'আরে না। কি যে বলেন। আপনাকে খামাখা এখানে রেখে যাব কেন? আপনি বিড়াল হলেও একটা কথা ছিল। আমি আবার বিড়াল ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপারে এক্সপার্ট। বিড়াল কিভাবে ফেলে দিয়ে আসতে হয় জানেন?'

'না।'

'একটা বস্তায় ভরতে হয়। বস্তার ভিতর নিতে হয় কর্পূর। যাতে কর্পূরের গন্ধে অন্য সব গন্ধ ঢাকা পড়ে যায়। অনেক দূরে নিয়ে বস্তার মুখ খুলতে হয়। বস্তার মুখ খুলবার আগে বস্তাটা ঝ ঝ করে ঘুরাতে হয় যাতে বিড়ালের দিকভ্রম হয়।'

'অনেক কায়দা-কানুন দেখি।'

'হ্যাঁ অনেক। তারপরেও বিড়াল গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাসায় চলে আসে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মিউ মিউ করে ডাকে। মনটা খুব খারাপ হয় ভাইসাব। আহা! বেচারা কতদূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে। মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই। আবার বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে আসতে হয় আরো দূরে। আবারো চলে আসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিউ মিউ করে।'

লোকটি নীচু গলায় বলল, বিড়াল মিউ মিউ করে যে কথাগুলি বলে তা যদি

মানুষ বুঝতো তাহলে তাকে কোনদিন ফেলে দিয়ে আসতো না।

'বিড়াল কি বলে?'

'বিড়াল কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি আমাকে অনেক দূরে ফেলে দিয়ে এসেছিলে। আশ্রয় এবং খাদ্যের সন্ধানে আমি অন্য কোথাও যেতে পারতাম। তা যাইনি। তোমার কাছেই ফিরে এসেছি। অনেক কষ্টে ফিরেছি। কেন জান? তোমার প্রতি ভালবাসার জন্যে। এই ভালবাসা পশুর ভালবাসা হলেও ভালবাসা। এর অমর্যাদা করো না। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।'

'আপনাকে এসব কে বলেছে?'

'কেউ বলেনি। আমি অনুমান করেছি।'

'ভাই এই দেখেন আমার চোখে পানি এসে গেছে। আমি আবার হাইলি ইমোশনাল লোক। অল্পতেই আমার চোখে পানি এসে যায়। টিভির বাংলা সিনেমা যতবার দেখি ততবার কাঁদি। সবাই হাসাহাসি করে। সিনেমা দেখা ছেড়ে দিলাম এই কারণে।'

'মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা।'

'কারেক্ট কথা বলেছেন ভাই। এর চেয়ে গাছ হয়ে জন্মানো ভাল ছিল। মাঝে মাঝে গাছ হয়ে যেতে ইচ্ছা করে। হাসবেন না ভাই সত্যি বলছি।'

'গাছ হওয়া তো খুব সহজ।'

'খুব সহজ? কি বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ খুব সহজ। গভীর বনের মাঝামাঝি একটা ফাঁকা জায়গায় দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গায়ে কোন কাপড় থাকবে না। মাথায় রোদ পড়বে, বৃষ্টি পড়বে, রাতে চাঁদের আলো পড়বে। আস্তে আস্তে শরীরটা গাছের মত হয়ে যেতে থাকবে। প্রথম দিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা হবে। আস্তে আস্তে কমে যাবে। রোদে পুড়ে গায়ের চামড়া শক্ত হতে থাকবে। পায়ের তলা দিয়ে শিকড় বেরুবে।'

'সত্যি বলছেন নাকি ভাই?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'কতদিন লাগে?'

'কারো জন্যে খুব অল্পদিন লাগে। আবার কারো জন্যে দীর্ঘ সময় লাগে।'

'আমার কতদিন লাগবে বলে মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না। আপনার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করছে।'

'ট্রাই করে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

'দেখুন না।'

'পুরোপুরি নগ্ন না হয়ে যদি একটা আণ্ডার ওয়্যার থাকে তাতে অসুবিধা হবে?'

'না। তবে পুরোপুরি নগ্ন হতেই অসুবিধা কি? কেউ তো দেখছে না।'

'সেটাও সত্যি। আচ্ছা ভাই আপনি অনেস্টলি বলুন তো — আমি কি দেখব চেষ্টা করে?'

দেখুন। অন্তত একদিন এবং একরাত দেখুন। যদি দেখছেন পারছেন না, বাসায় চলে আসবেন।'

মন্টুর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। সে নিজের ভেতর অন্য এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছে। সে গাঢ় স্বরে বলল, ব্রাদার একটা কথা।

'বলুন।'

'আপনি এক কাজ করুন। গাড়ি নিয়ে চলে যান। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবেন আমি থেকে গেছি। কি জন্যে সেটা বলবেন না। ওরা হাসাহাসি করতে পারে।'

'জ্বি আচ্ছা বলব না।'

লোকটা বাসায় ফিরল বিকেল পাঁচটায়।

সে সরাসরি বাসায় আসেনি। গাড়ি নিয়ে সারা শহর ঘুরেছে। ড্রাইভার বিরক্ত হলেও কিছু বলে নি।

মতিন সাহেব বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন — তিনি লোকটাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বিস্মিত হলেন। লোকটি বলল, ফিরতে খানিকটা দেরী করলাম। গাড়ি নিয়ে খুব ঘুরেছি। আশাকরি কিছু মনে করবেন না।

'মন্টু? মন্টু কোথায়?'

'উনি মৌচাকে থেকে গেলেন। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।'

মতিন সাহেব কি বলবেন ভেবে পেলেন না। লোকটি গুন গুন করতে করতে নিজের ঘরের দিকে এগুচ্ছে —

সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা
কহ কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।

সুরমাকে নিয়ে আজ চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা। মতিন সাহেব

কোন উৎসাহ বোধ করছেন না। তাঁর ভেতর এক ধরনের অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। তাঁর মন বলছে লোকটিকে তাড়িয়ে দিতে হবে। অতি দ্রুত তাড়িয়ে দিতে হবে।

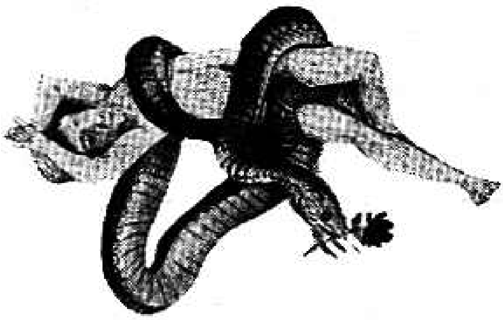

দু'টি খাট পাশাপাশি। হরিপ্রসন্ন বাবু এক খাটে — অন্য খাটে মিস্টার আগস্ট। রাত প্রায় দশটা বাজে। কাজের মেয়ে ঘরেই রাতের খাবার দিয়ে গিয়েছিল। খাওয়া শেষ হয়েছে। হরিবাবু কিছুই প্রায় খেতে পারেননি। সন্ধ্যা থেকেই তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এখন বেশ বেড়েছে। তাঁর মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস ঠিকই নিতে পারছেন — ফেলতে পারছেন না। ফুসফুসে বাতাস ক্রমেই জমা হচ্ছে।

মিস্টার আগস্ট বলল, ভাই আপনার শরীরটা কি খারাপ?

হরিবাবু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

'নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?'

'হুঁ।'

'লুডু খেলবেন? মিতুর লুডু সেটটা আমার কাছে আছে।'

হরিবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, লুডু?

'হ্যাঁ লুডু। সাপ লুডু।' এই খেলায় এক ধরনের উত্তেজনা আছে। উত্তেজনার কারণে — শারিরীক কষ্ট অনেকটা কমে যাবে। খেলবেন?'

'না।'

'খেলে দেখুন না। ভাল না লাগলে বন্ধ করে দেবেন।'

হরিবাবু অবাক হয়ে দেখলেন লোকটা লুডু বোর্ড মেলে ধরেছে। পাগল না-কি লোকটা? তিনি শুনেছেন লোকটা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। মাথাও যে খারাপ হয়ে গেছে সে কথা তাকে কেউ বলে নি।

'তাই খেলবেন? নিন আপনি প্রথম দান দিন। সাপ লুডুর নিয়ম জানেন তো – – এক না উঠলে ঘুটি ঘর থেকে বেরুবে না।'

'আমি খেলব না।'

'আপনার দানগুলি আমি চেলে দেব। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'না — আমার শরীর ভাল না।'

'তা হলে তো আমাকে একা একাই খেলতে হয়।'

হরিবাবু শুয়ে পড়লেন। কাজের মেয়েটা মশারী খাটিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ঘরে বাতি জ্বলছে। সেই বাতির আলো চোখে লাগছে। পাশের খাটে বসে লোকটা খট খট শব্দে লুডুর দান ফেলছে। হরিবাবু বললেন, বাতিটা নেভাবেন? চোখে আলো লাগছে।

'ও আচ্ছা আচ্ছা। নিভিয়ে দিচ্ছি, আপনি ঘুমুনোর চেষ্টা করুন।'

লোকটা বাতি নিভিয়ে বাইরে বেরুতেই — ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়তে লাগল। হরিবাবুর তন্দ্রার মত এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাও কেটে গেল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। কারণ অনেক অনেকদিন আগের একটা ঘটনা তাঁর মনে পড়ে গেছে। সেই ঘটনার সঙ্গে আজকের রাতের ঘটনার এত অদ্ভুত মিল —। হরিবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুর বাড়ি গিয়েছেন। চৈত্র মাস — অসহ্য গরম। আরতী অনেক রাতে ঘুমুতে এসে বলল — এই গরমে তুমি ঘুমুতে পারবে না — এক কাজ করলে কেমন হয় — এসো আমরা লুডু খেলি। সাপ লুডু।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, পাগল না–কি?

আরতী লুডু বোর্ড মেলে দিয়ে বলল, সাপ লুডু খেলার নিয়ম জানো তো? এক না পড়লে ঘুটি বের হবে না।

'আমি খেলব না। কি সব ছেলেমানুষী করছ।'

'তোমার দানগুলি আমি চেলে দেব। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি প্রথম দান দেই কেমন —?'

তিনি চুপ করে রইলেন। আরতী একা একাই খেলে যাচ্ছে। চাল দিচ্ছে। উত্তেজনায় তাঁর মুখ ইষৎ লালচে। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, অন্য কোথাও গিয়ে খেল তো। কানের কাছে খট খট করবে না। ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে যাও।

আরতী মুখ কালো করে ঘরের বাতি নিভিয়ে বাইরে চলে গেল। আর তখনি ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

এতদিন পর একই ঘটনা আবার কি করে ঘটল? রহস্যটা কি? হরিবাবু ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। লোকটাকে দেখতে পেলেন না।

মিস্টার আগস্ট দোতলায় উঠে এসেছে।

সাবেরের ঘরে হালকা টোকা দিয়েছে। সাবের সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, ভাই আসুন।

'এখনো জেগে আছেন?'

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। জানতাম রাত তিনটার দিকে আপনি আসবেন। বসুন, ঐ চেয়ারে বসুন। আমার কাছে আসবেন না।'

'কেন?'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছে। আমাকে ডাবল অসুখে ধরেছে।'

'ডাবল নিউমোনিয়া?'

'জ্বি-না। নিউমোনিয়া শুধু বাঁ লাংসটা ধরেছে। ডানটা ঠিক আছে।'

'ডাবল অসুখ বললেন যে?'

'চিকেন পক্স হয়ে গেছে রে ভাই। সারা শরীরে ফুটে বের হয়েছে। দারুণ ইন্টারেস্টিং। একসঙ্গে কয়েকটি অসুখ সম্পর্কে জানতে পারছি।'

'চিকিৎসা করাচ্ছেন?'

'না। রোগের গতি-প্রকৃতি দেখছি, চিকিৎসা করাটা ঠিক হবে না।'

'আবার যদি মরে টরে যান।'

'সেই সম্ভাবনা তো আছেই। নো রিস্ক নো গেইন।'

'আমার মনে হয় না আপনি মরবেন। মানুষের মনের জোর যখন পুরোপুরি চলে যায় মৃত্যু তখনি আসে। আপনার মন শক্তই আছে।'

'সত্যি কথা বলেছেন। আমার মনের জোর একশগুণ বেড়ে গেছে। আমার যে এত বড় অসুখ বাসার কেউ জানেই না। হাসিমুখে সবার সঙ্গে গল্প করি। সবার ধারণা সামান্য ঠাণ্ডা। এদিকে চিকেন পক্সে গা পচে যাচ্ছে।'

'তাই না-কি।'

'হ্যাঁ ঘা হয়ে গেছে। ইনফেকশন। এন্টিবায়োটিক শুরু করা উচিৎ।'

'শুরু করবেন না?'

'না। দেখি। আরো কিছুদিন দেখি।'

'জ্বর আছে?'

'জ্বর তো আছেই। জ্বর থাকবে না?'

সাবের উঠে বসল। গলার স্বর নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, আসল ব্যাপার আমি এখনো আপনাকে বলিনি। আমার স্মৃতিশক্তি এখন স্বাভাবিক পর্যায়ে আছে। যা পড়ি মনে থাকে।'

'অসুখের মধ্যেও পড়ছেন?'

'পড়ব না? কি বলেন আপনি? ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছি।'

'কবিতা? কবিতাও পড়ছেন না-কি?'

সাবের লজ্জিত মুখে বলল, জ্বি তাও মাঝে মধ্যে পড়ছি। জানি কাজটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু কেন জানি ভাই ভাল লাগে।

লোকটা চেয়ারে পা উঠিয়ে বসল। সহজ গলায় বলল, সবশেষে যে কবিতাটা পড়লেন সেটা শোনান তো।

'সত্যি শুনতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

সাবের বালিশের নীচ থেকে রুলটানা খাতা বের করল। লাজুক গলায় আবৃত্তি শুরু করল —

"নারে মেয়ে, নারে বোকা মেয়ে,
আমি ঘুমোবো না। আমি নির্জন পথের দিকে চেয়ে
এমন জেগেছি কত রাত,
এমন অনেক ব্যথা আকাঙ্ক্ষার দাঁত
ছিঁড়েছে আমাকে। তুই ঘুমো দেখি, শান্ত হয়ে ঘুমো।
শিশিরে লাগেনি তার চুমো,
বাতাসে উঠেনি তার গান।
ওরে বোকা,
এখনো রয়েছে রাতি, দরজায় পড়েনি তার টোকা"

কবিতা পড়তে পড়তে সাবেরের চোখে পানি এসে গেল। সে লজ্জিত চোখে তাকিয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হাসল।

লোকটা বলল, সাবের সাহেব আমার একটা কথা রাখবেন?

'অবশ্যই রাখব। কি কথা বলুন তো?'

'আপনি ডাক্তারী পড়া-শোনাটা ছেড়ে দিন। কবিতা লিখতে শুরু করুন।

আপনি পারবেন। সবাই সব কিছু পারে না। একেক জনকে একেক ধরনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়।'

'কে পাঠান?'

লোকটি এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সাবের দুঃখিত গলায় বলল, চলে যাচ্ছেন?

'হ্যাঁ।'

'কেন বলুন তো?'

'দেখছেন না — ঝুম বৃষ্টি নেমেছে।'

'ভাবছি বৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ভিজব।'

'বৃষ্টিতে ভিজবেন? আপনি খুবই স্ট্রেঞ্জ মানুষ।'

'সব মানুষই স্ট্রেঞ্জ।'

'হ্যাঁ তাও ঠিক। আমারো বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে।'

'খুব বেশী করছে?'

'হ্যাঁ খুব বেশী। মনে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজতে না পারলে মরে যাব।'

'তাহলে চলে আসুন।'

'চলে আসব? বাসার কেউ দেখে ফেললে দারুণ হৈ চৈ করবে।'

'কেউ দেখবে না। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবাই আরাম করে ঘুমুচ্ছে।'

'তাহলে চলে আসি কি বলেন?'

'আসুন।'

'উঠতে পারছি না — হাতটা ধরে টেনে তুলুন।'

তারা দু'জন কাঁঠাল গাছের নীচে গিয়ে বসল। সাবের মুগ্ধ গলায় বলল, অপূর্ব! অপূর্ব!

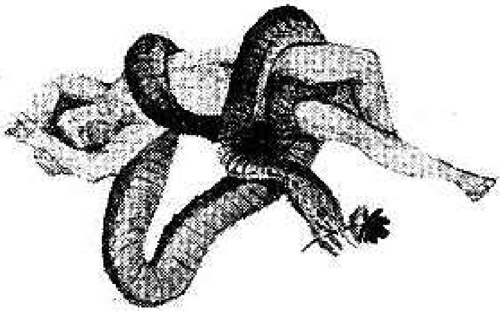

ভোরবেলা মন্টু এসে উপস্থিত। তার চোখ লাল। জামা-কাপড় কাদা-পানিতে মাখামাখি। খালি পা, চোখে-মুখে কেমন দিশেহারা ভঙ্গি। প্রথমেই দেখা হল এষার সঙ্গে। এষা বলল, ব্যাপার কি মামা?

মন্টু থমথমে গলায় বলল, ঐ ব্যাটা আছে না গেছে?

'মিস্টার আগস্টের কথা বলছ?'

'হুঁ।'

'আমার কাছ থেকে একটা কথা শুনে রাখ্। তার ত্রিসীমানায় যাবি না। ভুলেও না। ব্যাটার কথা শুনে আমার জীবন সংশয় হয়ে গেল। আরেকটু হলে গাছ হয়ে যেতাম।'

'গাছ হয়ে যেতে মানে?'

'ইন ডিটেইলস কিছু বলতে পারব না। মাথা ঘুরছে। রেস্ট নিতে হবে। জুতা জোড়াও গেছে। নতুন জুতা, পাঁচশ' টাকায় কেনা। এষা।'

'জ্বি মামা?'

'আমি যে ফিরে এসেছি ঐ লোককে বলবি না। খবরদার না। ঐ লোক ডেনজারাস লোক। ভেরী ডেনজারাস। ভুজুং ভাজুং দিয়ে আমাকে প্রায় গাছ বানিয়ে ফেলেছিল।'

'তুমি এসব কি বলছ মামা।'

মন্টু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এষা বলল, মামা তুমি এক্ষুণি বাবার সঙ্গে দেখা কর। বাবা তোমার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন। বাবার ধারণা, তোমার বড় রকমের কোন বিপদ হয়েছে।

'বিপদ হতে যাচ্ছিল। অল্পের জন্যে বেঁচেছি।'

মতিন সাহেব মন্টুর বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন। মন্টুর গল্প তিনি বিশ্বাস

করছেন এমন মনে হল না। আবার অবিশ্বাস করছেন তাও মনে হল না। মতিন সাহেবের এক পাশে এষা অন্য পাশে মিতু। দু'জনই গভীর আগ্রহে গল্প শুনছে। এষা গল্পের মাঝখানে দু'বার হেসে ফেলল। মন্টু বলল, আরেকবার হাসলে চড় খাবি। একটা সিরিয়াস এক্সপেরিয়েন্স বলছি — আর তুই হাসছিস।

'তারপর দুলাভাই শুনুন কি হল। ঐ ব্যাটা ফট করে আমার মাথায় গাছ হওয়ার আইডিয়া ঢুকিয়ে দিল। মনে হয় ম্যাসমেরিজম জানে। যা-ই হোক, গাছ হবার জন্যে আমি একটা ফাঁকা জায়গায় দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়ালাম। একটু ভয় ভয় করতে লাগল। কি গাছ হব তা জানি না। ব্যাটা কিছু বলে যায়নি। একটু দুঃশ্চিন্তাও হচ্ছে। আমার ইচ্ছা বটগাছ হওয়া। যা-ই হোক, দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বৃষ্টি। ঝুম বৃষ্টি। দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে আছি। কেমন অন্য রকম লাগছে। তারপর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পায়ের পাতায় কিড়বিড় করছে। শিকড় গজিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। আমি দিলাম এক লাফ . . .'

এষা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

মন্টু বলল, এষা তুই এখান থেকে চলে যা। তুই না গেলে গল্প শেষ করব না। কি রকম ইডিয়টের মত হাসছে।

এষা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে গেল। মতিন সাহেব একবারও হাসলেন না। শীতল গলায় বললেন, মন্টু তুমি গল্পটা গোড়া থেকে বল। কোন কিছু বাদ না দিয়ে।

'ডিকশনারী মুখস্থ থেকে শুরু করব?'

'ডিকশনারী মুখস্ত মানে?'

'ব্যাটা তো ডিকশনারী মুখস্থ করে বসে আছে — আপনি জানেন না?'

'না-তো!'

'এতক্ষণ ধরে আপনাকে আমি কি বলছি — দুলাভাই? ডেঞ্জারাস লোক। ওকে এক্ষুণি বাড়ি থেকে বের করে দেয়া দরকার। তবে খুব ট্যাক্টফুলি কাজটা করতে হবে। ও যেন বুঝতে না পারে।'

'তুমি গল্পটা বল। আগে আমি গল্পটা মন দিয়ে শুনি। কিছুই বাদ না দিয়ে বলবে।'

মন্টু গল্প শুরু করল।

মতিন সাহেব গভীর আগ্রহে গল্প শুনছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না।

এষা জুবায়েরকে টেলিফোন করেছে। এষা হাসির যন্ত্রণায় ঠিকমত কথা

পর্যন্ত বলতে পারছে না। জুবায়ের বলল, ব্যাপার কি এত হাসছ কেন? হিস্টিরিয়া হয়ে গেছে না-কি?

'হিস্টিরিয়া হবার মতই ব্যাপার। আমার ছোট মামা — মানে মন্টু মামা — উনি গাছ হয়ে গেছেন।'

'উনি গাছ হয়ে গেছেন। কি গাছ বোঝা যাচ্ছে না। উনার ইচ্ছা ছিল বটগাছ হওয়ার। হি-হি-হি . . .'

'কি বলছ ভালমত বল তো — গাছ হওয়া মানে?'

'এখনো পুরোপুরি হয়নি। পাতা বের হয়নি তবে শিকড় সম্ভবত গজিয়েছে। হি- হি- হি . . .'

'শোনো এষা, তোমার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তুমি চলে এসো। মামার কাছ থেকে গল্পটা শুনে যাও।'

'আমার একটা সমস্যা হয়েছে — অফিসে আটকা পড়েছি। এই মুহূর্তে আসতে পারব না। তুমি বরং এক কাজ কর, আমার এখানে চলে এস। গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর এক সঙ্গে তোমাদের বাসায় যাব। দুপুরে তোমাদের ওখানে খাব — এবং তোমার মামার গল্প শুনব। রাখলাম, কথা বলতে পারছি না।'

মতিঝিলের একটি হাইরাইজ বিল্ডিং-এ জুবায়েরের অফিস। এগারোতলা ফ্লোরের এক-চতুর্থাংশ। বিদেশী কায়দায় সুন্দর করে সব গোছানো। জুবায়েরের অফিস ঘরের বাইরে ছোট্ট কিউবিক্যালে অল্পবয়স্কা একজন তরুণী। বসার ভাব-ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে হয় স্টেনো কিংবা রিসিপশনিস্ট। এষাকে দেখেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। মিষ্টি করে বলল, স্যার ভেতরে আছেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এষা এর আগেও দু'বার এই অফিসে এসেছে। কোন মহিলা স্টেনো দেখেনি। মেয়েটিকে নতুন নেয়া হয়েছে।

এষা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

জুবায়েরের ঘর ঠাণ্ডা। এয়ার কুলার চলছে। জানালার সানশেড নামানো। জুবায়েরের টেবিলে একটি টি পট। দু'টা খালি কাপ। জুবায়ের বলল, তোমার জন্যে চা বানিয়ে বসে আছি।

'থ্যাংক ইউ। একটা মেয়ে দেখলাম। তোমার স্টেনো না রিসিপশনিস্ট?'

'দুটোই — অফিসের শোভা বলতে পার।'

'কবে স্টেনো নিয়েছো?'

'এই মাসেই। আজ এই মেয়ের দ্বিতীয় দিন।'

জুবায়ের উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

এষা বলল, দরজা বন্ধ করলে কেন?

'নিরিবিলি চা খাচ্ছি, এই জন্যে দরজা বন্ধ করলাম। এই দরজার টেকনিক কি জান? ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলেই বাইরে লাল বাতি জ্বলে ওঠে। অর্থাৎ রেড সিগন্যাল, প্রবেশ নিষেধ।'

এষা শুকনো গলায় বলল, চা খাবার জন্যে রেড সিগন্যাল লাগবে কেন? প্লীজ দরজা খোল।

জুবায়ের বলল, তুমি এমন করছ কেন? আমি লক্ষ্য করেছি আমার সঙ্গে একা হলেই তুমি অস্বস্তি বোধ কর। দু'দিন পর আমরা বিয়ে করছি। করছি না?

'প্লীজ দরজা খোল। আমার সত্যি অস্বস্তি লাগছে।'

'অস্বস্তি লাগছে?'

'হ্যাঁ অস্বস্তি লাগছে। শুধু অস্বস্তি না ঘেন্নাও লাগছে। বাইরে একটি মেয়ে বসে আছে আর তুমি দরজা বন্ধ করে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিলে? ছিঃ।'

জুবায়ের উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। শীতল গলায় বলল, চা খাও। না-কি চাও খাবে না?

এষা চায়ের কাপে চা ঢালল। একটা কাপ এগিয়ে দিল জুবায়েরের দিকে। জুবায়ের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঠাণ্ডা গলায় বলল, এষা একটা ব্যাপার আমার ভালমত জানা দরকার। তুমি কি আমাকে পছন্দ কর?'

'হ্যাঁ করি।'

'আমাকে বিয়ে করার মানসিক প্রস্তুতি কি তোমার আছে?'

'আছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তুমি সব সময় আমার কাছ থেকে এক ধরনের দূরত্ব বজায় রাখতে চাও। এটা আমি লক্ষ্য করেছি। এটা আমার অবজারভেশন।'

'তোমার অবজারভেশন ঠিক না।'

'আমাকে তুমি যদি পছন্দ কর, যদি আমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি তোমার থাকে তাহলে আমার প্রসঙ্গে তোমার কোন রকম দ্বিধা থাকা উচিত না। তোমার ভেতর দ্বিধা আছে। বড় রকমের দ্বিধা আছে।'

'তুমি এসব কি বলছ?'

'তোমার ভেতর যে কোন দ্বিধা নেই তা তুমি খুব সহজেই প্রমাণ করতে পার।'

'কিভাবে?'

'তুমি নিজে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করবে। লাল বাতি জ্বালিয়ে দেবে। তারপর ... ।'

'তারপর কি?'

'তারপরেরটা তারপর। আপাততঃ প্রথম দু'টি কাজ কর।'

এষা উঠে দাঁড়াল। শুরুতে তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে দরজা খুলে চলে যাবে। তা সে করল না। দরজা বন্ধ করে শুকনো গলায় বলল, এখন কি? জুবায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লম্বা লম্বা টান দিচ্ছে সিগারেটে। ঘর সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে।

সুরমা ছেলের বিছানার কাছে বসে আছেন। সাবেরের আকাশ পাতাল জ্বর। দু'জন ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে। দু'জনের কেউই এখনো এসে পৌঁছান নি।। সুরমা থমথমে গলায় বললেন, তোর এমন অসুখ আমি তো কিছুই জানি না।

'তুমি ব্যস্ত থাক — তোমাকে বলিনি।'

'এমন কি ব্যস্ত থাকি যে অসুখের খবরটাও বলা যাবে না।'

সাবের ক্ষীণ স্বরে বলল, বৃষ্টিতে ভেজাটা ঠিক হয়নি। লোভ সামলাতে পারলাম না।

'কবে বৃষ্টিতে ভিজেছিস?'

'কাল রাত তিনটার দিকে। মিঃ আগস্ট বললেন — তিনি বৃষ্টিতে ভিজবেন . . . শুনে আমার খুব লোভ লাগল . . . '

সুরমা সাবেরকে কথা শেষ করতে দিলেন না। কঠিন মুখে একতলায় নেমে এলেন। মিস্টার আগস্টকে পাওয়া গেল না। সে নাকি ঘুরতে বের হয়েছে। আরেকটি দৃশ্য দেখে সুরমা খানিকটা চমকালেন — হরিবাবু বিছানায় উবু হয়ে বসে একা একা লুডু খেলছেন। গভীর মনযোগের সঙ্গে খেলছেন। সুরমা যে ঘরে ঢুকেছেন — এই দৃশ্যটিও তাঁর চোখে পড়েনি।

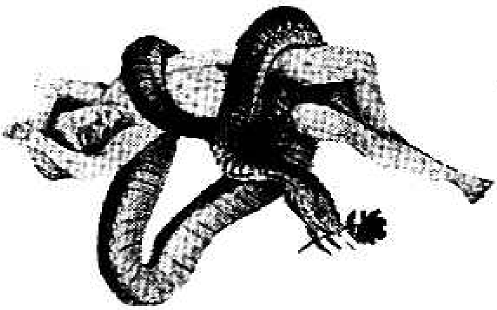

মিতু বলল, বাবা তোমার টেলিফোন। মতিন সাহেব বললেন, বলে দে আমি বাসায় নেই। তিনি দোতলার বারান্দায় রাখা ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে শুয়ে আছেন। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। দু'ঘণ্টায় ন'টি সিগারেট খাওয়া হয়েছে। কোন কিছুতেই তাঁর মন বসছে না। সাবেরের অসুখের এতটা যে বাড়াবাড়ি তা তিনি বুঝতেই পারেননি। ছেলের সঙ্গে ইদানীং তাঁর যোগাযোগ নেই বললেই হয়। সাবের তাঁর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। এটা জানেন বলেই তিনি নিজেকে দূরে দূরে রাখেন। তার মানে এটা না যে সাবের অসুস্থ হলেও তিনি জানবেন না। ডাক্তারের কথা শুনে তিনি বেশ বিচলিত বোধ করছেন। দু'জন ডাক্তারই বললেন, ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন।

তিনি বললেন, কেন?

'বেটার কেয়ার হবে।'

'এইখানে কি বেটার কেয়ার হবে না বলতে চাচ্ছেন?'

'তা—না। হবে নিশ্চয়ই তবে হাসপাতালে সব সময় হাতের কাছে ডাক্তার থাকবে।'

'প্রয়োজন হলে এখানেও হাতের কাছে ডাক্তার রাখব। তাছাড়া আমার ছেলে নিজেও একজন ডাক্তার। রেকর্ড নম্বর পেয়ে এম.বি.বি.এস. পাশ করেছে।'

'কোন ইমার্জেন্সি হলে হাতের কাছে সবকিছু থাকবে। এই জন্যেই হাসপাতালের কথা বলা। অন্য কোন কারণ না।'

'ইমার্জেন্সি হবে এ রকম আশংকা কি করছেন?'

'হ্যাঁ করছি। অবস্থা ভাল না।'

মতিন সাহেব ছেলেকে হাসপাতালে পাঠাননি। সার্বক্ষণিক সেবার জন্যে

একজন নার্স এনেছেন। ডাক্তার একজনও রাখতে চেয়েছিলেন, সাবের রাজি হয়নি। আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে বলেছে — ডাক্তার লাগবে কেন বাবা? আমি নিজেই তো ডাক্তার। আগে সব ভুলে গিয়েছিলাম — এখন সব মনে পড়ছে। ফার্মাকোলজির বইটা হাতে নিয়ে যে কোন প্রশ্ন কর — আমি বলে দেব।

সাবেরের কথাবার্তা ঠিক সুস্থ মানুষের কথাবার্তা নয়। যে ছেলে বাবার ভয়ে অস্থির থাকতো আজ সে বাবার সঙ্গে বন্ধুর মত গলায় কথা বলছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এভাবে কথা বলা সম্ভব নয়।

'বাবা, আমার সমস্যাটা কি ডাক্তাররা তোমাকে বলেছে — ?'

'না।'

'আমাকেও বলেনি — তবে তাঁরা সন্দেহ করছেন — চিকেন পক্স দূষিত হয়ে গ্যাংগ্রীনের মত হয়ে গেছে। তুমি কি আমার গা থেকে পচা গন্ধ পাচ্ছ?'

'না।'

'পচা গন্ধ পেলে বুঝতে হবে গ্যাংগ্রীন। গ্যাংগ্রীনের **Causative Agents** কি, বলব?'

'বলতে ইচ্ছে হলে বল।'

'**Clostrodium welchii, gram positive, anaerobic bacilli ...** বাবা আমি কিন্তু সব মুখস্থ বলে যাচ্ছি।'

'তাই তো দেখছি।'

'একজন ভাল ডাক্তারের যে জিনিসটা সবচে' বেশী দরকার তা হচ্ছে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি।'

'কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে থেকে রেস্ট নেয়াটা বোধ হয় ভাল।'

মতিন সাহেব ছেলের কাছ থেকে সরে এসে বারান্দায় বসেছেন। সাবেরের পাশে তার মা এবং নার্স মেয়েটি আছে। সুরমা অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। নার্স মেয়েটিও ভয় পেয়েছে।

মিতু আবার এসে বলল, বাবা তোমার টেলিফোন।

মতিন সাহেব বললেন, বল বাসায় নেই।

'এক মিথ্যা দু'বার বলা যায় না বাবা। মিস্টার আগস্ট বলেছেন।'

'তোমাকে যা বলতে বলেছি বল।'

'বড় আপা টেলিফোন করেছে — নিশা আপু।'

মতিন সাহেব যন্ত্রের মত উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন।

'বাবা, কেমন আছ?'

'ভাল।'

'বাসার সবাই ভাল?'

'হ্যাঁ।'

'মিথ্যা কথা বলছ কেন বাবা? সাবেরের তো খুব অসুখ।'

'হ্যাঁ ওর শরীরটা ভাল নেই।'

'এই খবর তোমরা আমাকে জানাওনি।'

'ভুল হয়ে গেছে।'

'এ রকম ভুল ইদানীং তোমাদের খুব ঘন ঘন হচ্ছে। তুমি একটা এ্যাকসিডেন্ট করেছিলে। একটা লোককে প্রায় মেরেই ফেলেছিলে — তাকে তুলে এনেছ। এখন সে আমাদের বাসাতেই আছে — এই খবরও দাওনি।'

'এটা তেমন কোন খবর না।'

'অবশ্যই বড় খবর। লোকটা অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে . . .'

'কোনই অদ্ভুত কাণ্ড করছে না।'

'মিতু বলল করছে, মন্টু মামাকে নাকি বটগাছ বানিয়ে দিয়েছে . . .'

'মিতু কি বলছে — তাই বিশ্বাস করে বসে আছিস?'

'মিতু তো বাবা কখনো মিথ্যা কথা বলে না।'

'বেশ, বাসায় এসে তাহলে তোর বটগাছ মন্টু মামাকে দেখে যা। বটগাছের নীচে বসে খানিকক্ষণ হাওয়া খেয়ে যা।'

'তুমি এমন রেগে রেগে কথা বলছ কেন বাবা?'

'রাগ হচ্ছে বলেই রেগে রেগে কথা বলছি।'

'তুমি কি গাড়িটা পাঠাতে পারবে?'

'না। গাড়ি নিয়ে এষা সকালে বের হয়েছে, এখনও ফেরেনি।'

মতিন সাহেব টেলিফোন রেখে আগের জায়গায় এসে বসলেন। বুঝতে পারছেন নিশার সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবহার তিনি তাঁর মেয়েদের সঙ্গে কখনো করেন না। সকাল থেকেই মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। বেলা যতই বাড়ছে মেজাজ ততই খারাপ হচ্ছে। এখন দুপুর।

মিতু ঢুকলো, বাবা আবার টেলিফোন। নিশা আপা ফোন করেছে। তুমি নাকি তাকে বকা দিয়েছ? সে কাঁদছে।

'কাঁদুক।'

মিতু ফিরে গেল। নিশাকে বলল, বাবাকে বলেছিলাম তুমি কাঁদছ। বাবা বললেন — কাঁদুক।

সুরমা অফিসে হাজিরা দিতে গেছেন।

ব্যাংকের চাকরিতে হুট করে এ্যাবসেন্ট করা যায় না। এ.জি.এম-কে জানাতে হবে। আজকের দিন ছাড়াও আরো দুদিন ছুটি নেবেন। তাঁর মাথায় যন্ত্রণা অন্যদিন সন্ধ্যার পর হয়, আজ শুরু হয়েছে দুপুর থেকে। সাবের তার ঘরে একা। নার্স মেয়েটি ঘরের বাইরে বারান্দায় চেয়ারে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। মেয়েটি অসম্ভব রোগা — শ্যামলা চেহারা। সরল মুখ। চোখ দেখে মনে হয় কোন কারণে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, রোগা বলেই বোধ হয় আরো কম দেখা যায়। নার্স-এর পেশায় মেয়েটি দু'বছর কাটিয়েছে — এর মধ্যেই রোগ এবং রোগী সম্পর্কে নির্বিকার ভাব চলে আসা উচিত ছিল, তা আসেনি।

মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রুগীকে এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর সময় হয়ে গেছে। রুগী এখন ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙ্গিয়ে হলেও অষুধ খাওয়াতে হবে। এক মিনিট এদিক-ওদিক হতে দেয়া যাবে না।

সাবেরের গায়ে হাত দেয়া মাত্র সে চোখ মেলল।

'স্যার, আপনার অষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।'

সাবের বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি আমাকে স্যার বলছেন কেন? আগেও বলব ভাবছিলাম। মনে থাকে না — আপনি নাম ধরে ডাকবেন। ভাল কথা — আপনার নাম কি?

'হৈমন্তী।'

'বাহ্, চমৎকার। হেমন্ত ঋতুতে জন্ম বলেই কি হৈমন্তী?'

'জ্বী।'

'আমাদের এখানে একজন আছেন তাঁর নাম মিঃ আগস্ট। তাঁর সঙ্গে কি কথা বলেছেন?'

'জ্বি-না।'

'কথা বলে দেখবেন। চমৎকার মানুষ।'

'জ্বি — আচ্ছা, কথা বলব। নিন, অষুধটা খান।'

'আমি অষুধ খাব না বলে ঠিক করেছি।'

'কখন ঠিক করলেন?'

'কিছুক্ষণ আগে। চোখ বন্ধ করে এই ব্যাপারটাই ভাবছিলাম। আমি ভেবে দেখলাম কি জানেন? আমি চিন্তা করে দেখলাম — এই মুহূর্তে আমার শরীরে আছে লক্ষ কোটি জীবাণু। অষুধ খাওয়া মানে এদের ধ্বংস করা। সেটা ঠিক হবে না। আমাদের যেমন জীবন আছে, ওদেরও জীবন আছে — সুখ-দুঃখ আছে। একটি জীবনের জন্যে লক্ষ কোটি জীবন নষ্ট করার কোন কারণ দেখি না।'

'ছেলেমানুষি করবেন না — অষুধ খান।'

'না। অষুধ থাক — আপনি বরং একটা কবিতা শুনুন।'

'আগে অষুধ খান — তারপর শুনব। তার আগে না।'

'বললাম তো অষুধ খাব না।'

হৈমন্তী মতিন সাহেবকে ডেকে নিয়ে এল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি নাকি অষুধ খেতে চাচ্ছ না?

'না। অষুধ খাওয়া মানে লক্ষ কোটি জীবাণুর মৃত্যুর কারণ হওয়া।'

'অষুধ না খেলে তুমি নিজে মারা যাবে। তোমার শরীরেও লক্ষ কোটি জীবন্ত কোষ আছে। ওদেরও মৃত্যু হবে।'

'তোমার কথা খুবই ঠিক বাবা। তবে যুক্তিতে ভুল আছে। আমাদের শরীরে লক্ষ কোটি জীবকোষ থাকলেও আমাদের একটি মাত্র চেতনা। কিন্তু জীবাণুগুলির স্বাধীন সত্তা আছে। এরা প্রত্যেকেই আলাদা।'

'তোমাকে কে বলেছে? জীবাণুগুলির সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছে?'

'জ্বি হয়েছে।'

'কখন কথা হল?'

'পরশু রাতে প্রথম কথা হয়েছে। তারপরেও কয়েকবার কথা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে কথা বলা একটা সমস্যা — সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে চায় — আর কথা বলে খুব দ্রুত . . .।'

'তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ না যে তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বাবা।'

'জীবাণুদের সঙ্গে কথা বলার এই কায়দা তোমাকে কে শিখিয়েছেন? মিস্টার আগস্ট?'

'কথা বলছ না কেন? মিস্টার আগস্ট শিখিয়েছেন?'

'কেউ শেখায়নি। আমি নিজে নিজেই শিখেছি।'

মতিন সাহেব কিছু না বলে বারান্দায় নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল — সিগারেট আনতে পাঠালেন। দারোয়ানকে বলে দিলেন — মিস্টার আগস্ট আসামাত্র যেন তাঁকে খবর দেয়া হয়।

মিতু এসে বলল, এষা আপু এসেছে।

মতিন সাহেব বললেন, আমার কাছে আসতে বল।

'ও আসবে না। দরজা বন্ধ করে কাঁদছে।'

'কাঁদছে বুঝলে কি করে?'

'শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে যাও।'

'কোথায় যাব?'

'কোথায় যাবে আমি জানি না। আপাতত আমার সামনে থেকে যাও।'

'তুমি আমার উপর রাগ করছ কেন? আমি কি করলাম?'

'যাও আমার সামনে থেকে। যাও বলছি।'

মিতুর চোখে পানি এসে গেল। সে চোখ মুছতে মুছতে বাবার সামনে থেকে চলে গেল এবং পর মুহূর্তেই ফিরে এসে বলল, বাবা নিশা আপু এসেছে।

মিস্টার আগস্ট এলেন সন্ধ্যার পর।

বাসায় তখন তুমুল উত্তেজনা। এম্বুলেন্স এসেছে — সাবেরকে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। সুরমা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। নিশা এবং এষা কাঁদছে না, তবে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। মিস্টার আগস্টের বাড়িতে ঢোকা কেউ লক্ষ্য করল না — সে চলে গেল কাঁঠাল গাছের দিকে। সেখানে আগে থেকেই কে যেন বসে আছে। মোটাসোটা একজন মানুষ।

আগস্ট বলল, কে?

লোকটি দারুণ চমকে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ এতটা চমকায় না।

আগস্ট আবার বলল, ভাই, আপনি কে?

'আমি সিরাজুল ইসলাম।'

'ও আচ্ছা চিনেছি — আপনি মিতুর সবচেয়ে বড় বোনের হাসব্যাণ্ড?'

'জ্বি।'

'এখানে বসে আছেন কেন?'

'বাসায় কান্নাকাটি হচ্ছে — আমি ভাবলাম একটু দূরেই থাকি। জামাইরা

কখনো বাড়ির মেইন স্ট্রীমের সঙ্গে মিশতে পারে না। তাছাড়া বাড়ির কেউ চায়ও না জামাইরা তাদের সঙ্গে মিশে যাক। ভাল কথা, আপনি কে?'

'আমার নাম আগস্ট।'

'ও আচ্ছা, আপনি আগস্ট?'

'জ্বি।'

'মাই গড। আমি ভেবেছিলাম অদ্ভুত একজন কাউকে দেখব। ঋষিদের মত চুল, দাড়ি — লম্বা, ফর্সা। আপনাকে তো খুবই নরম্যাল একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

'খুব নরম্যাল না। আমি পুরোনো কথা কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'এ্যামনেশিয়া?'

'ডাক্তার তাই বলেছে।'

'আপনার সম্পর্কে এত সব অদ্ভুত কথা কেন রটছে বলুন তো? মন্টুকে নাকি গাছ বানিয়ে দিয়েছেন?'

আগস্ট বসতে বসতে বলল, ঠিক বানাইনি, বানানোর কৌশল ব্যাখ্যা করলাম।

সিরাজুল ইসলাম বিস্মিত হয়ে বললেন, গাছ বানানোর কৌশল আবার কি?

আগস্ট কোন জবাব দিল না। সিরাজুল ইসলাম সাহেব একটু সরে বসলেন। লোকটা উন্মাদ হতে পারে। কিছু কিছু উন্মাদ সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। তাদের পাগলামি হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে। এ-ও মনে হচ্ছে সে রকম কেউ। দীর্ঘদিন একে এ বাড়িতে পোষা হচ্ছে কেন সেও এক রহস্য।

সিরাজুল ইসলাম উঠে দাঁড়ালেন।

আগস্ট বলল, চলে যাচ্ছেন?

সিরাজুল ইসলাম জবাব দিলেন না। পাগল মানুষের প্রতিটি কথার জবাব দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। আগস্ট বলল, আপনার কাছে সিগারেট থাকলে দয়া করে একটা দিয়ে যান।

সিরাজুল ইসলাম আবার ভাবলেন, বলবেন, আমি সিগারেট খাই না। মিথ্যা কথাটা চট করে মুখে এল না। তিনি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন — দু'টা মাত্র সিগারেট। তিনি প্যাকেটটাই কাঁঠাল গাছের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

আগস্ট বলল, দিয়াশলাই? দিয়াশলাই না দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি দিয়াশলাইও ছুঁড়ে ফেললেন।

সাবেরকে হাসপাতালে নেয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র উপায় ছিল জোর করে এম্বুলেন্সে তোলা — মতিন সাহেব নিষেধ করলেন। অবোধ শিশুদের উপর জোর খাটানো যায়। সাবের শিশু নয়, অবোধও নয়। তাছাড়া যে চিকিৎসা এখানে করা সম্ভব হচ্ছে না সে চিকিৎসা হাসপাতালে কিভাবে করা হবে? মতিন সাহেব কঠিন গলায় বললেন, সাবের, তুমি যে মারা যাচ্ছ তা কি বুঝতে পারছ?

'পারছি — জীবাণুরা আমাকে বলেছে।'

'ওদের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা তাহলে এখনো হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'তুমি যে নিতান্তই পাগলের মত কথা বলছ তা কি বুঝতে পারছ?'

'পারছি — কিন্তু আমি যা বলছি তা সত্য। জীবাণুরা যে কোন ভাবেই হোক আমার সঙ্গে কম্যুনিকেট করতে পারছে। তোমাদের ব্যাপারটা আমি বোঝাতে পারছি না, কারণ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি তোমাদের নেই।'

'তুমি তো আমাদেরই একজন। তোমার ভেতর সেই মানসিক প্রস্তুতি কি করে হয়ে গেল?'

'মিস্টার আগস্ট আমাকে সাহায্য করেছেন।'

মতিন সাহেব থমথমে গলায় বললেন, সে তোমাকে জীবাণুর সঙ্গে কথা বলা শিখিয়েছে?'

'তা — না, ব্যাপারটা কি হয়েছে আমি তোমাকে বলি — মানুষের অসুখ কি করে হয় ঐ ব্যাপারটা মিস্টার আগস্ট জানতেন না। আমি একদিন তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, পুরো ব্যাপারটা হয় জীবাণুঘটিত নয় ভাইরাসঘটিত। তখন তিনি খুব আগ্রহ করে জানতে চাইলেন — আচ্ছা ঐ জীবাণুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না? ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলে খুব সুবিধা হত। তারপর থেকে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি. . .।'

'তুমি তাহলে প্রথম ব্যক্তি যে জীবাণুদের সঙ্গে কথা বলল?'

'এর আগেও হয়ত কেউ কেউ করেছে — এটা তেমন কঠিন কিছু না।'

'এর আগে কেউ যদি করে থাকে তাহলে এতদিনে আমরা কি তা জানতে পারতাম না?'

'না। যাদের এই সৌভাগ্য হয়েছে তারা ভেবেছে এটা এক ধরনের স্বপ্ন। এক ধরনের ভ্রান্তি। তারা নিজেরাও ঠিক বিশ্বাস করেনি, কাজেই কাউকে বলেনি।'

'তোমার ধারণা এটা স্বপ্ন বা ভ্রান্তি নয়?'

'আমার তাই ধারণা।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে সাবের। তোমার ব্রেইন এখন নন-ফাংশোনিং।'

সাবের চোখ বন্ধ করে ফেলল। দীর্ঘ সময় কথা বলার কারণে সে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। তার শ্বাসকষ্ট শুরু হল। মতিন সাহেব সুরমার দিকে তাকালেন। সুরমা তাঁর ছেলের মাথার কাছে মূর্তির মত বসে আছেন। তাঁর পেছনে খাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিশা। সে পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেছে। মতিন সাহেব মিস্টার আগস্টের খোঁজে বের হলেন। আগস্ট ফিরে এসেছে এবং কাঁঠাল গাছের নিচে বসে আছে এই খবর তিনি পেয়েছেন।

মতিন সাহেবকে দেখে আগস্ট উঠে দাঁড়াল।

মতিন সাহেব তীব্র গলায় বললেন, আপনি কে ঠিক করে বলুন তো?

আগস্ট শান্ত গলায় বলল, আমি কে তা আমি জানি না। জানলে অবশ্যই বলতাম।

'আপনি জানেন না আপনি কে?'

'জ্বি না। এবং মজার ব্যাপার কি জানেন — আপনি নিজেও জানেন না আপনি কে? এই পৃথিবীর কোন মানুষ জানে না সে কে? সে কোথা থেকে এসেছে — সে কোথায় যাবে।'

'আপনি আমার পরিবারে যে ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তা-কি আপনি জানেন?'

'পুরোপুরি না জানলেও আঁচ করতে পারছি।'

'কাল সকালে সূর্য ওঠার পর এই বাড়িতে আমি আপনাকে দেখতে চাই না। আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন?'

'পারছি। আপনি চাইলে আমি এখনো চলে যেতে পারি!'

'এত রাতে কোথায় যাবেন?'

'হাঁটতে শুরু করব, তারপর আপনার মত একজন কেউ আমাকে পাবে . . . তাঁর বাসায় কিছুদিন থাকব। তারপর . . .'

'আপনার জীবন কি এই ভাবেই কাটছে?'

'আমি জানি না। সত্যি জানি না — জানলে আপনাকে জানাতাম। কাঁঠাল গাছের নিচে বসে আমি প্রায়ই ভাবি — আমি কে? পুরানো স্মৃতি বলে আমার কিছু নেই। আমি বাস করি বর্তমানে।'

মতিন সাহেব কঠিন গলায় বললেন, আপনি আমাকে কনফিউজ করার চেষ্টা করবেন না, আমি মন্টু না যে আপনার কথা শুনে গাছ হবার জন্য মাঠে দাঁড়িয়ে থাকব বা জীবাণুদের সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করব . . .

'আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন।'

মতিন সাহেব শান্ত গলায় বললেন, আপনি কি দয়া করে আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন? ওকে বুঝাবেন যে জীবাণুদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা যায় না। সে যা করছে তা নেহায়েত পাগলামী . . . '

'পাগলামী তো না-ও হতে পারে।'

'তার মানে?'

'হয়ত সে সত্যি ওদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে।'

মতিন সাহেব রাগে কাঁপছেন। তীব্র রাগে তিনি কয়েক মুহূর্ত চোখে অন্ধকার দেখলেন — একবার ইচ্ছে হল পাগলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজেকে সামলালেন। বাগান থেকে ঘরের দিকে রওনা হলেন। ক্লান্তিতে পা ভেঙ্গে আসছে।

•

মিতু এসে আগস্টকে বলল, আপনাকে খেতে ডাকছে।

আগস্ট উঠে দাঁড়াল। মিতু বলল, ডাইনিং ঘরে খাবার দিয়েছে।

আগস্ট কিছু বলল না। কাজের মেয়ে তার খাবার ঘরে দিয়ে যায়। আজ প্রথম ডাইনিং ঘরে ডাক পড়ল। শেষ খাবার বলেই বোধ হয়। আগস্ট ভেবেছিল ডাইনিং হলে অনেকেই থাকবে। দেখা গেল শুধু সে আর মিতু। এষা খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। এষার চোখ মুখ কঠিন হয়ে আছে। সে খাবার-দাবার টেবিলে রাখছে যন্ত্রের মত।

আগস্ট বলল, আমি কাল ভোরে চলে যাচ্ছি। আপনাদের অনেক বিরক্ত করলাম — কিছু মনে করবেন না।

এষা উত্তর দিল না। মিতু বলল, আর আসবেন না? আগস্ট ভাত মাখতে মাখতে বলল, ভবিষ্যতের কথা তো আমি বলতে পারি না। আসতেও পারি। হয়ত কুড়ি, পঁচিশ বা ত্রিশ বছর পর আবার দেখা হবে।

মিতু বলল, তখন কি আপনি আমাকে চিনতে পারবেন?

'চিনতে না পারারই কথা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পাল্টে যায়। তবে তুমি তোমার নাম যদি বল — আমি চিনতে পারব। মানুষের চেহারা পাল্টালেও নাম পাল্টায় না।'

খাওয়া এগুচ্ছে নিঃশব্দে। মিতু টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এষা আগস্টের মুখোমুখি বসল। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। চুপ করে গেল। শুধু তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে।

আগস্ট বলল, আপনি কি কিছু বলতে চাচ্ছেন? বলতে চাইলে বলে ফেলুন। আর সুযোগ পাবেন না।

এষা নীচু গলায় বলল, আপনি কে আমি জানি না। জানতেও চাই না — হয়ত আপনি কেউ না, সাধারণ একজন মানুষ — কিংবা হয়ত বিশেষ ধরনের একজন মানুষ . . . আপনি যেই হোন, আমি হাত জোর করে আপনার কাছে একটা অনুরোধ করব।

'করুন।'

'ভাইয়ার মাথায় যে পাগলামীটা ঢুকেছে তা আপনি দূর করে দিন।'

'যাবার আগে আমি অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বলব। তবে তাতে লাভ হবে কি–না জানি না। সে যা করেছে তা যদি পাগলামী না হয় তাহলে তা দূর করা তো অসম্ভব।'

এষা শান্ত গলায় বলল, আমার একটি ব্যক্তিগত সমস্যাও আপনাকে বলতে চাই। বলতে ইচ্ছা করছে বলেই বলছি। আমার কোন লাভ হবে বলে বলছি না —

'বলুন। আমি খুব মন দিয়ে শুনছি।'

এষা নরম গলায় বলল, একটা ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আমার ধারণা ছিল ছেলেটাকে আমি পাগলের মত ভালবাসি। এখন মনে হচ্ছে বাসি না। আবার মনে হচ্ছে বাসি। আপনি তো অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলেন — আপনি কি এমন কিছু জানেন যা আমার মনের দ্বিধা দূর করতে পারবে?

আগস্ট শব্দ করে হাসল।

এষা আহত গলায় বলল, হাসছেন কেন?

'হাসছি — কারণ একটি মেয়ে প্রেমে পড়েছে কি পড়েনি তা জানা খুব সহজ। কোন মেয়ে যদি প্রেমে পড়ে তাহলে তার মধ্যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা চলে আসে। সেই মেয়ে যদি কোন কাচের পাত্রে হাত রাখে সেই পাত্র গাঢ় নীল

বর্ণ ধারণ করে। আপনি একটি কাচের পাত্রে হাত দিয়ে দেখুন — পাত্রটি নীল হচ্ছে কিনা।

এষা চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলল, শুধু শুধুই আপনার সঙ্গে কথা বললাম — আপনি উন্মাদ। এর বেশী কিছু না। আমার মনে হয় আপনাকে কোন একটা ঘরে দীর্ঘদিন আটকে রাখা হয়েছিল। দরজা খুলে চলে এসেছেন।

'হতে পারে। বিচিত্র কিছু না।'

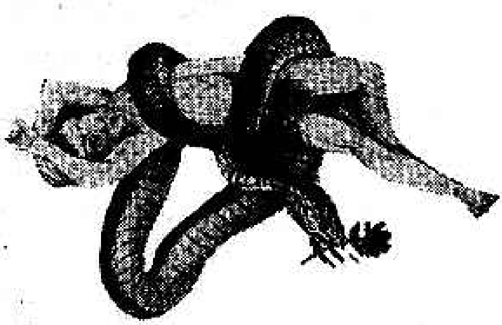

সাবের ঝিম মেরে পড়ে ছিল।

রাত প্রায় তিনটা। সুরমা ছেলের পাশে শুয়ে আছেন। এতক্ষণ তিনি জেগেই ছিলেন, কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন। নার্স মেয়েটি বারন্দার চেয়ারে জেগে বসে আছে। মিস্টার আগস্টকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। রুগীর ঘরে ঢুকতে নিষেধ করতে যাচ্ছিল — কি ভেবে যেন করল না।

মিস্টার আগস্ট ঘরে ঢুকলো। সাবেরের কপালে হাত রাখতেই সে চোখ মেলে বলল, আমি জেগে ছিলাম।

'তাই না-কি?'

'জ্বি। জীবাণুদের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'কি কথা?'

'ওদের একটা কবিতা শুনালাম — আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন, ওরা কবিতা পছন্দ করে। তবে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে হয়। যেমন দরজা — দরজা ব্যাপারটা কি ওরা জানে না — মজার কথা না!'

'মজার কথা তো বটেই।'

'আপনাকেও কবিতাটা শোনাই।'

'আমাকে শুনাবে কেন? আমি তো আর জীবাণু না।'

সাবের হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই কবিতা শুরু করল —

দু'হাতে দরজা খুলতেই দেখি তুমি
যে ব্যথা বুকের মাঝে গোপনে পুষেছি
এতোকাল ধরে, সারক্ষণ সাথী ছিল
[তোমার বিকল্পরূপে — শুধু এই ব্যথা]
কি করে নামাই বলো, তোমাকে দেখেই।

চারচোখ অপলক শুধু মেলে রাখা
কারো কোন কথা নেই, অথচ কখন
অবাক চোখের ভাষা অতিদ্রুত গতি
কেড়ে নিল দুজনের প্রিয়-সম্ভাষণ

কেন যে এমন হলো, কেন যে এমন।

মিস্টার আগস্ট বলল, জীবাণুরা আপনার এই কবিতা পছন্দ করেছে?

'জ্বি – ঐ যে বললাম, কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। যেমন চার চোখে চেয়ে থাকা মানে কি, দরজা মানে কি, দু'হাত ব্যাপারটা কি? ওদের জগৎ আর আমাদের জগৎ তো ভিন্ন।'

'তাতো বটেই। ওরাও কি কবিতা লেখে?'

'জিজ্ঞেস করিনি।'

'একবার জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা — আপনার মৃত্যু মানে তো ওদেরও মৃত্যু। তা নিয়ে ওরা কি দুঃখিত না?'

'না। ওদের জীবনটা ক্ষণস্থায়ী। স্ফূলিঙ্গের মত। উড়ে যাবে, নিভে যাবে। ওরা এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত।'

'আপনার সঙ্গে তো ওদের এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছে — আপনার মৃত্যুতে তারা কি কষ্ট পাবে না?'

'জিজ্ঞেস করি নি।'

'দেখুন না — জিজ্ঞেস করে।'

সাবের খানিক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। এক সময় চোখ মেলে বলল, ওরা বলেছে ওরা অসম্ভব কষ্ট পাবে।

'তাহলে ওদের আপনি বলুন না — আপনাকে মুক্তি দিতে। ওদের তো ক্ষণস্থায়ী জীবন। সেই জীবন তো ওরা ভোগ করল — আর কত।'

'বলব?'

'হ্যাঁ বলুন?'

'এটা বলতে লজ্জা করছে।'

'লজ্জার কিছু নেই, আপনি বলুন।'

সাবের চোখ বন্ধ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে বলল, ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে। ওরা চায় না আমার মৃত্যু হোক।

'এখন তাহলে অষুধ খাবেন?'

'অষুধ খেতে হবে না। ওরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে। ওদের সে ক্ষমতা আছে। আচ্ছা আমি যেসব কথাবার্তা বলছি তা-কি আপনি বিশ্বাস করছেন?'

'করছি। অবশ্যই করছি। ভাই, আমি তাহলে যাই?'

'কোথায় যাবেন?'

'জানি না।'

'আমার মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।'

'হতেও পারে, কিছুই বলা যায় না। এই জগৎ বড়ই রহস্যময় — ভাই, আমি যাই। সূর্য ওঠার আগে আমাকে বিদেয় হতে হবে।'

মিস্টার আগস্ট ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র সাবের তার মাকে ডেকে তুলল। সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, এক কাপ চা খাওয়াতে পার, মা।

সুরমা ছেলের গায়ে হাত রাখলেন। জ্বর নেমে গেছে। সাবেরের মুখ হাসি-হাসি।

'মা, কড়া করে চা বানাবে। নোনতা বিস্কিট থাকলে চায়ের সঙ্গে নোনতা বিসকিট দিও — প্রচণ্ড ক্ষিদে লেগেছে।'

হরিপ্রসন্ন বাবু ঘুমিয়ে ছিলেন।

মিস্টার আগস্ট তাকে ডেকে তুলে বলল, আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি

— আমি কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হব। বেশ কয়েকদিন আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাটালাম। কথাবার্তা তেমন হয় নি। হলে ভাল লাগতো।

হরিপ্রসন্ন বাবু বললেন, রাতের বেলা কোথায় যাচ্ছেন?

'আসতে হয় দিনে — যাবার জন্যে তো রাতই ভাল।'

'আপনার কথা বুঝলাম না।'

'কথার কথা বলেছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। সরি, ঘুম থেকে ডেকে তুললাম।'

'না, না, অসুবিধা নাই।'

'আচ্ছা ভাল কথা — আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে?'

হরিপ্রসন্ন বাবু চমকে উঠে বললেন, আমি! আমি কোথায় যাব? না, না, কি বলছেন আপনি?

'আপনি রাজি থাকলে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম।'

'আরে না।'

'আচ্ছা, ভাই, তাহলে ঘুমান। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। চাদরটা গায়ে দিয়ে নিন।'

মিস্টার আগস্ট দরজা ভেজিয়ে বারান্দায় এল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টিতে সে নেমে গেল নিঃশব্দে। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পেত — দোতলার বারান্দা থেকে মতিন সাহেব তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

কুড়ি বছর পরের কথা।

আমেরিকার মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটি।

ইউনিভার্সিটি কফি শপে একজন বাংলাদেশী ছাত্রীকে বসে থাকতে দেখা

যাচ্ছে। তার হাতে কফির মগ। টেবিলে স্থানীয় পত্রিকা বিছানো। মেয়েটি অলস ভঙ্গিতে পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলি দেখছে। মেয়েটির নাম মিতু। সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইভার অপটিকস-এ পোষ্ট ডক করছে। একা একা থাকে। বেশীর ভাগ সময়ই তাকে খুব বিষণ্ন দেখা যায়। জীবন তার প্রতি খুব সুবিচার করেনি। আমেরিকায় পড়তে আসা তার এক ধরনের স্বেচ্ছা নির্বাসন।

মিতু বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে উঠল। এতটা চমকাল যে হাতের কফির মগ থেকে গরম কফি ছিটকে পড়ল গায়ে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একজন হাসিখুশী যুবকের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে লেখা — এই যুবকটি নিম্ন ঠিকানায় আছে। যুবকটি এক ধরনের এ্যামনেশিয়ায় ভুগছে। পুরোনো স্মৃতি মনে নেই। তার কোন খোঁজ-খবর বের করা যাচ্ছে না। যদি কেউ এই যুবকটি সম্পর্কে কিছু জানেন তাহলে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন দিয়েছে স্টেট পুলিশ।

যুবকটির ছবির দিকে মিতু অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

মিতু তাকে চেনে — তার নাম মিস্টার আগস্ট। এ ব্যাপারে মিতুর মনে কোন সন্দেহ নেই । মিতু পত্রিকা হাতে উঠে দাঁড়াল।

চোদ্দ নম্বর পুলিশ প্রিসিংক্ট-এ যুবকটি আছে। উনিশ ডাউন স্ট্রীট — নর্থ। এই হল ঠিকানা। কতক্ষণ লাগবে সেখানে যেতে? বড়জোর কুড়ি মিনিট। মিতুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

যুবকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিতু খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। নীল চোখ এবং সোনালী চুলের একজন আমেরিকান যুবক তার সামনে বসে আছে। যুবকটির চোখে মুখে চাপা হাসি। মিতু নিশ্চিত যে, সুদূর শৈশবে দেখা মিস্টার আগস্টের সঙ্গে এই যুবকের চেহারার অসম্ভব মিল — তবু এই আমেরিকান যুবক মিস্টার আগস্ট হতে পারে না। পুলিশের জনৈক কর্মকর্তা বললেন, মিস্ আপনি কি এই যুবককে চেনেন?

মিতু বলল, না।

সে ফিরেই আসছিল। হঠাৎ কি মনে করে যুবকের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বলল, এক সময় আমার নাম ছিল পাঁচ হাজার ছয় শত চুয়ান্ন। আজ আমার নাম বার হাজার তিনশ' একুশ। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?

যুবকটি মিতুর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইংরেজীতে বলল, কেমন আছ মিতু?

মিতুর চোখে পানি এসে গেল।

পুলিশ অফিসার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, মিস্ আপনি কি যুবকটিকে চিনতে পারছেন? তাকে কি আপনার পরিচিত মনে হচ্ছে?

মিতু তাকিয়ে আছে যুবকের দিকে। যুবক মাথা নীচু করে বসে আছে। পা নাচাচ্ছে। তার মুখ হাসিহাসি।

মিতু বলল, আমি চিনি না। আমি এই যুবককে চিনি না।

♠♠